আদি মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি ও প্রসার (rise and growth of regional languages during Mediaeval Period)

আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিকতাবাদ। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ণ, মুদ্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট, ভাষার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষার এযুগে উৎপত্তি ও প্রসার ঘটে। এযুগে ভারতে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে উদ্ভব ঘটে বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, তামিল, তেলেগু ও কন্নড়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মসংস্কারকগণ জনসাধারণের সুবিধার্থে সহজবোধ্য স্থানীয় কথ্য ভাষায় বক্তব্য রাখতেন এবং গ্রন্থ রচনা করতেন। এর ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বৌদ্ধ, জৈন ও ভক্তিবাদীদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবে ও বিকাশে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতে ভক্তিধর্মের প্রচারকদের দান অনন্য। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষা ও কথ্যভাষায় প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করে প্রচারকগণ আঞ্চলিক ভাষার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

আর্যগণের বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে বাংলার মানুষের মুখের ভাষা কী ছিল তা জানা যায় না। আর্যগণের বাংলাদেশে আগমনের পর আর্যভাষার প্রচলন শুরু হয়। বাংলার সর্ব প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এই ভাষা হতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এযুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ভাষার নিদর্শন হল মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি প্রস্তরলিপি। পাল ও সেন যুগেও সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। আবার সেনযুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করে রেখেছে। পালযুগে বৌদ্ধ ও শৈব আচার্যগণ গান ও দোঁহা রচনা করেছিলেন। এগুলি 'চর্যাপদ' নামে প্রসিদ্ধ এবং এই 'চর্যাপদই' বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এই চর্যাপদের আবিষ্কারক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপাল থেকে 'চর্যাপদের' পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। এপর্যন্ত মোট ২২ জন কবি রচিত মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ১২টি চর্যাপদের রচয়িতা ছিলেন কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নপাদ। এই চর্যাপদগুলির মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং এর প্রভাবেই পরবর্তী যুগের বাংলার সহজিয়া গান, বাউল গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর উৎপত্তি হয়। এগুলির হয়তো সাহিত্যিক মূল্য ততটা নেই কিন্তু এগুলির আবেগ, চিত্রকল্প, ব্যঞ্জনা, ধর্মীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপই বাংলাদেশের জনগণের মুখের ভাষা। শুধুমাত্র বঙ্গভাষা নয়, মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে পূর্বভারতীয় অসমীয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ও ভোজপুরীরও উৎপত্তি ঘটেছে।

তবে বঙ্গদেশে তুর্কি বিজয়ের ফলে বাংলা ভাষার প্রচারে বাধা সৃষ্টি হয়নি, বরং সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকালেও বাংলা ভাষা মাতৃভাষা রূপে সমাদৃত হয়েছিল।প্রখ্যাত পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "ব্রাহ্মণগণ প্রথমত বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও বংশীদাসকে এঁরা 'সর্বনেশে' উপাধি প্রদান করেছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত। করেছিলেন।" তুর্কি বিজয়ের শুরুতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বিকাশ হয়নি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি প্রবর্তনের পর শাস্ত্র আলোচনার পুনঃপ্রবর্তন ও পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। এযুগের চর্যাপদ ছাড়াও সংস্কৃত মানসোল্লাস ও প্রাকৃত পয়ঙ্গল গ্রন্থে বাংলা ভাষার স্পষ্ট আভাস দেখতে পাওয়া যায়। এযুগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মাতৃভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা (১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁর লেখনীতে জনগণের সহজবোধ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। তাই দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন "আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" কারণ বাঙালীর সঙ্গে বহুকাল বসবাসের ফলে বাংলা ভাষা মাতৃভাষার মতো তাদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিপ্লব ঘটে যায়।

জৈন অপভ্রংশ সাহিত্যের ঐতিহ্য গুজরাতি ভাষার সাহিত্যের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল। প্রাচীন গুজরাতি ভাষার প্রথম যুগের সূচনাকাল সহস্রাব্দ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত। গুজরাতি সাহিত্যে প্রথম দিকে গদ্য বা ছন্দোবদ্ধ ভাষা ছিল না, কবিতার ভাষায় ভাব প্রকাশ করা হত। এরকমই গুজরাতি কবিতার একটি নিদর্শন হল রসবন্ধ। তবে গুজরাটের সন্ত, পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিক জৈনশাস্ত্রজ্ঞ হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক অপভ্রংশ থেকে প্রায় একশো দুটি চরণের কবিতার সংকলন করেছিলেন। এই অপভ্রংশের ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় সে যুগে ব্যবহৃত হত। এই সংকলনের শেষ ব্রজভাষা ও খড়িবোলি। মাড়োয়ারী ও গুজরাতিরা তাঁদের মাতৃভাষার আদিরূপ বলে দাবি করেছেন। এই লেখাগুলিতে সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, প্রেম, প্রীতি, বেদনা ও বীরত্বের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এছাড়া সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে 'বারহমাসা', 'মাতৃকা' ও 'বিবাহল'। আবার কিছু রসকাব্য আছে যেগুলিতে জৈন সন্তদের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও গুজরাতি ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ব্রজসেন রচিত ভরতেশ্বর বাহুবলী ঘোর (১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ)। ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় শালিভদ্রের রচিত ভারত বাহুবলী রস। এই গ্রন্থটি সম্ভবত গুজরাতি সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ।

এই যুগে প্রাচীন গুজরাতি সাহিত্যের গদ্যে শুধুমাত্র গুজরাতিতে নয়, মাড়ওয়ার ও মালবের রূপকথা লেখা হয়েছিল এবং এইসব রূপকথার সংকলন 'বালবোধ' নামে পরিচিত। এইসব বালবোধের মধ্যে গুজরাতিতে জৈন সন্ন্যাসী তরুণ প্রভর সংকলন অন্যতম বলে পরিচিত। জৈন ও ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের রচিত গদ্যের ও ইতিবৃত্তের সন্ধান এই সময়কার গুজরাতি সাহিত্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ বা জৈন নন এমন অপর সম্প্রদায়ের লেখা গ্রন্থেরও সংখ্যা কম নয়। এইসব অলঙ্কার বহুল কাব্যের উদাহরণ হিসাবে বসন্তবিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গুজরাটে আশ্রয়প্রার্থী ও পরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পার্সী সম্প্রদায়ভুক্তরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্থা ত্রয়োদশ শতকে পহ্লবী থেকে গুজরাতি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রাচীন গুজরাতি কাব্যের মধ্যে রণমল্লচন্দা, ঊষা হরণ, সীতা হরণ এবং গদ্য আলঙ্কারিক ভাষায় প্রবোধ চিন্তামণি প্রভৃতির নাম গুজরাতি সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষার মতো মারাঠি ভাষারও উদ্ভব ঘটেছে লেখ থেকে। মারাঠি ভাষারও প্রাচীন নিদর্শন ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রবণবেলগোলায় প্রাপ্ত একটি লেখ। তাই খ্রিস্টীয় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে মারাঠি ভাষার উদ্ভব বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মারাঠি ভাষায় লেখা পাওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে মারাঠি সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক শঙ্করাচার্যের অনুগামী মুকুন্দরাজ। তিনি ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন একটি দার্শনিক গ্রন্থ বিবেকসিন্ধু।

মারাঠি ভাষাকে প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং এর সঙ্গে কোঙ্কনী কথ্যভাষার ও উত্তর ভারতীয় আর্য ভাষার কোন কোন বিষয়ে মিল দেখা যায়। মহারাষ্ট্রে নামদেব ও তাঁর উত্তরসূরিদের সময় থেকে মারাঠি ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে যে সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় পুনরুত্থানের জন্য যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল গোবিন্দ রানাডে তাকে ইওরোপের প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার ও শুষ্ক আচরণসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ও জাতিবর্ণ ভিত্তিক বিভেদের বিরুদ্ধে ভক্তি আন্দোলনের হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী আবেদন সহজ ও সরল ভাষায় জনগণের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। ফলে সহজ ভাষায় বুঝতে পেরে কারিগর শ্রেণীর লোক ও ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নামদেবের মৃত্যুর পর তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ প্রভৃতি প্রচারকগণ মহারাষ্ট্রের জনগণের কাছে মাতৃভাষায় ভক্তিমার্গকে প্রচার করেন। মারাঠা ঐতিহাসিক গোবিন্দ রানাডের মতে তুর্কি আক্রমণের ফলে কিছুকাল মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'মহানুভব' সম্প্রদায় ও বারকারী সম্প্রদায়ের অনুচরদের প্রচেষ্টায় পুনরায় ভক্তি সংগীত ও কাব্য চর্চা মহারাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। এই বারকারী সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানদেব 'জ্ঞানেশ্বরী' রচনা করেন। এটি ভগবত গীতার টীকা হিসাবে মারাঠি ঐতিহাসিকরা বারকারী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করেন। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন নামদেব। নামদেবের অনুগামীরা বেদান্তদর্শন প্রচার করে মহারাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। নামদেবের অনুগামী তুকারাম সন্ত কবি হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। নরসিংহ সরস্বতী ও

একনাথের গুরু জ্ঞানার্জন স্বামী মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের সহায়ক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই এযুগের লেখক ও শিক্ষক হিসাবে বারকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নরসিংহ সরস্বতীর একজন শিষ্য গুরুচরিত নামে এক কাব্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে দেবতুল্য সন্ত দত্তাত্রেয়র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। আবার মহারাষ্ট্রে যারা 'কীর্তন সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও বহু গান ও কবিতা রচনা করে মারাঠি ভাষার সমুন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে দ্রাবিড় ভাষা প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাচীনতম তামিল সাহিত্যের সূচনা সয়েছিল। তামিল ঐতিহ্য অনুসারে মাদুরাই-এ তিনটি সাহিত্য সঙ্গমের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সাহিত্য সঙ্গমে উপস্থিত কবিগণ 'এটুটোগাই' অর্থাৎ 'আট সঙ্কলন' রচনা করেছিলেন। এই 'আট সঙ্কলন'কে তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনে করা হয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র তামিলভূমিতে আর্য প্রভাব বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করে। সেখানকার হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যার ফলে তামিল সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে তামিল সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব অপেক্ষা জাগতিক বিষয়ের অধিক প্রাধান্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে ধর্মীয় চেতনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে ভক্তিধর্মের প্রেমভক্তির কাব্য, শৈব নায়নার ও বৈষ্ণব আলবার সন্তরা নবম শতাব্দীর মধ্যে অনবদ্য সঙ্গীত রচনা করেন। নবম শতকে এরই প্রভাবে কমবনের 'রামায়ণম্'-এর মতো ধ্রুপদী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কম্বনের 'রামায়ণম্'-কে সঙ্গতভাবেই তামিলদের মহাকাব্যের সম্মান দেওয়া হয়। তবে এই রামায়ণের রাবণের পাশে রামকে অনেক নিষ্প্রভ মনে হয়। মধ্যযুগের সূচনায় তামিল সাহিত্যের গৌরব তার ধর্মীয় সাহিত্য। শৈব নায়নার এবং বৈষ্ণব আলবারগণ তামিল সাহিত্যে ভক্তিমূলক স্তোত্রগুলি রচনা করেছিলেন। শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দুটি সংকলনের নাম যথাক্রমে 'তিরুমুরাই' এবং 'নলয়ির প্রবন্ধম'।

এছাড়া দাক্ষিণাত্যে কানাড়া ও তেলেগু ভাষার ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। আবার কানাড়া ভাষা তেলেগুর তুলনায় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। নবম শতকে লিখিত কবিরাজমার্গের মধ্যে অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে কানাড়া ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে জৈনধর্মের অনুপ্রেরণী ছিল। কানাড়া সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল। কানাড়া সাহিত্যে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলামেরও প্রভাব পড়েছিল। আবার একথাও অনস্বীকার্য কানাড়া, তেলেগু ও মালয়ালম ভাষা সংস্কৃতের ঐতিহ্য ও ভাষার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। কানাড়া ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় কাব্যে ও গদ্যে এক মিশ্র রীতির আবির্ভাব ঘটেছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতকে। এই রীতি 'চম্পা' নামে প্রচলিত হয়েছিল। কানাড়া সাহিত্যের ত্রিরত্ন নামে পরিচিত পন্না, পুন্না ও রানা এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। নারায়ণাপ্পা ছিলেন তেলেগু ভাষায় মহাভারতের অনুবাদক। নান্নিয়া তেলেগু ভাষায় মহাভারত লিখে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। কবি টিকান্না চম্পা রীতির অনুসরণে রামের জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেন। তেলেগু সাহিত্যের আর এক রত্ন হলেন এররানা। তিনি হরিবংশ ও নৃসিংহপুরাণ নামে গ্রন্থ দুটি লিখেছিলেন। বীর শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবর্তক বাসব ও তাঁর অনুচররা কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে সহজ সরল গদ্য রীতির বা 'বচনের' প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষ কানাড়া ভাষার অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং রত্নমালিকা, কবিরাজমার্গ রচনা করে কানাড়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটান। রাষ্ট্রকূটরাজদের আমলে চম্পু কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যের ভাষায় গদ্যের ও পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এছাড়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কানাড়া ভাষায় ভক্তিমূলক কাব্য রচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় এযুগে রাজা ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় কানাড়া ও তেলেগু উভয় ভাষাই সমৃদ্ধি লাভ করে। চোল, চালুক্য, বিজয়নগর ও মহীশূরের রাজারা উভয় ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রত্যেক রাজসভায় 'অষ্টদিগজ' বা আটজন কবি উপস্থিত থাকতেন। কানাড়া ও তেলেগু ভাষা রাজ আনুগত্য পাওয়ায় দাক্ষিণাত্যে এদুটি ভাষা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে আবার উভয় ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই এইসব দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আদিমধ্য যুগ ভারতে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের ক্ষেত্র রচনা করেছিল এবং পরবর্তীকালে এই ভাষাগুলি সমৃদ্ধি ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।

আদি মধ্যযুগে শিল্প, স্থাপত্য- ভাস্কর্য ও চিত্রকলা (Art, architecture, sculpture and painting during Mediaeval Period)

আদিমধ্য যুগে বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় সমগ্র ভারত ব্যাপী বিভিন্ন রাজ-বংশের অধীন কতকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রতিহার, পাল, সেন, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব, চোল প্রভৃতি রাজবংশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে আঞ্চলিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে এযুগে স্বতন্ত্র আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে এক স্বতন্ত্র সজীব ও সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। গুপ্তযুগে যে স্বতন্ত্র শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল তা এযুগে রুদ্ধ না হয়ে আরও প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে। গুপ্তযুগে সাহিত্য ও শিল্পের চরম বিকাশ ঘটলেও আদিমধ্য যুগের সাহিত্য ও শিল্প উপেক্ষণীয় তো ছিলই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার ছাপ স্পষ্ট। যদিও গুপ্তযুগে কালিদাস একাই সংস্কৃত সাহিত্যকে কালোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালে ভারবী ও মাঘ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবিশেষ অবদান রাখতে পেরেছিলেন। ভারবিকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থান দেওয়া হয়।

তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্য কীরাতার্জনীয় আঠারোটি সর্গে রচিত। বলিষ্ঠ চিন্তা ও ভাষার জন্য কাব্যটি সমধিক প্রসিদ্ধ। মাঘ ছিলেন সম্ভবত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি। তিনি কৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করে শিশুপালবধ মহাকাব্য রচনা করে অমর হয়ে আছেন। বুদ্ধঘোষ এযুগে লিখেছিলেন দশ সর্গে পদ্যচূড়ামণি। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কাশ্মীরের কবি মেন্থ রচনা করেন হয়গ্রীববধ। এর এক শতাব্দী পরে জন্মেছিলেন কুমার দাস। তিনি লিখেছিলেন' সীতাহরণ কাব্য। কুমার দাসের অল্পকাল পূর্বে ভট্টি তাঁর ভট্টিকাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে 'শতক' নামে এক ধরনের কবিতা রচিত হয়েছিল। 'শতক' কবিতার মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ ছিল ভর্তৃহরি রচিত শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক, এবং বৈরাগ্যশতক। সুন্দর ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি এই 'শতক' কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অমরুর লেখা অমরুশতকে রমণীর প্রেম সম্পর্কে অমরুর সংশয় ছিল। আর ময়ূর শতকের লেখক ময়ূর ও দেবীশতকের লেখক বাণ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন।

কালিদাসের পর নাট্যকারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বিশাখদত্ত। তিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মুদ্রারাক্ষস নাটক রচনা করেছিলেন। তবে এযুগে নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ভবভূতি। তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম কান্যকুব্জের অধিবাসী ছিলেন। কলহণ লিখেছেন যে তিনি যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন। নাট্যকার ভট্টনারায়ণ ভবভূতির সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর লেখা বেণীসংহার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত গদ্যরীতির লেখকদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দণ্ডিন, সুবন্ধু ও বাণ। এঁদের মধ্যে বাণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেছিলেন। রচনারীতির দিক থেকে সুবন্ধু এবং বাণের মধ্যে বেশ মিল আছে। তবে বাণের রচনা অনেক প্রাণবন্ত। আর এযুগের অমূল্য সম্পদ হল অমরকোষ। এটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী লেখা। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সর্বযুগেই ছিল। তবে কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট, দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি ও আইহোল প্রশস্তিলিপি রচয়িতা রবিকীর্তি, উত্তর-রামচরিত নাটক রচয়িতা ভবভূতি কোন কোন বিষয়ে কবিগুরু কালিদাসের প্রতিভাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধনামা ছিলেন ময়ূর, ভর্তৃহরি, সুবন্ধু, শ্রীহর্ষ, পারবনৃপতি মহেন্দ্রবর্মন, ভট্টনারায়ণ, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতি। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দের কোমল-কান্ত পদাবলী রচনা করেন। পঞ্চতন্ত্রের অভিনব সংস্করণ এযুগেই সঙ্কলিত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক ছিলেন না বললেই হয়। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে একাধিক গ্রন্থকার সমকালীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাণভট্টের হর্ষচরিত, কলহণ রচিত কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্গিণী, বিলহণ প্রণীত বিক্রমাঙ্কচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে কলহণের রাজতরঙ্গিণী-কেই প্রাচীন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা হয়। কনৌজের অধিপতি যশোবর্মনের সভাপতি বাপ্পতিরাজ গৌড়বহো নামক কাব্য রচনা করেন। পৃথ্বীরাজ রাসোর কবি চাঁদবরদাই, ভগবদগীতার মারাঠা টীকাকার জ্ঞানেশ্বর, তামিল তিরুবাসহম্ রচয়িতা মাণিক্যবসহর এবং কন্নড় মহাভারত রচয়িতা পন্নার নাম আদি মধ্যকালীন হয়েও আজও ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এযুগেই দার্শনিক ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট, শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র ও রামানুজের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল।

আবার জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি এযুগেই রচনা করেন ভাস্করাচার্য। এমনকি ভেষজ বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থও বাগ্‌ভট্ট ও চক্রপাণি এযুগে প্রণয়ন করেছিলেন। কল্যাণের চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বর মানসোল্লাস নামক এক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি বিবিধ জ্ঞানের আকর বিশেষ। ধারা-র অধিপতি ভোজ এবং কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র বহু শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন।

আদিমধ্য যুগে শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা অশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার মূল প্রাণকেন্দ্র মন্দিরশিল্প। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় ভারতীয় শিল্পকলার মূল প্রেরণা ছিল ধর্মমূলক। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও বহু মঠ মন্দির ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। কালের অমোঘ প্রকোপে ও বৈদেশিক আক্রমণে এযুগের উত্তর ভারতের বেশিরভাগ মন্দিরগুলিই ধ্বংস হয়েছে কিন্তু দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য আজও অক্ষত আছে। গুপ্তযুগের পর এযুগে যে শিল্পের বিবর্তন শুরু হয় তা শিল্পের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ ঘটে। গুপ্তযুগের মন্দির স্থাপত্যের শিল্পধারাই ভারতের ভবিষ্যৎ মন্দির স্থাপত্য শিল্পকলার মূল ভিত্তি রচনা করেছিল। গুপ্তযুগের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে এযুগের ভাস্কর্য-স্থাপত্যের তুলনা করলে গুপ্তযুগের স্থাপত্য ভারতীয় শিল্পকলায় এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। আমরা যে এযুগের মন্দিরগুলি পেয়েছি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তিন ধরনের মন্দির। এক ধরনের মন্দির হল সমতল বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির এবং একটা হালকা মণ্ডপ থাকত। আর এক ধরনের মন্দির হল ছাদ বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রাকার মন্দিরে মণ্ডপ থাকত কিন্তু এখানে গর্ভগৃহের চারদিকে পরিক্রমার জন্য ঢাকা জায়গা থাকত। আর এক ধরনের মন্দির দেখা যায় যেগুলি বর্গক্ষেত্রাকার কিন্তু এর উপরে একটি নীচু 'শিখর' থাকত। প্রকৃতপক্ষে এই তিন ধরনের মন্দির আদিমধ্য যুগের ভারতীয় স্থাপত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে মন্দিরগুলির মধ্যে সমতল ছাদযুক্ত বর্গক্ষেত্রকার ও সামনে হালকা একটা মণ্ডপসহ এযুগের মন্দিরের রূপ পরবর্তীকালে অন্যান্য মন্দিরের সম্প্রসারিত ও পরিবর্ধিত রূপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাঁচির বিষ্ণু মন্দিরকে এযুগের মন্দিরের প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যায়। অধ্যাপক সরস্বতীর মতে সাঁচির বিষ্ণুমন্দির পরবর্তীকালে শুধু ভারতের নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। তবে এখানে উল্লেখ্য 'শিখর' যুক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে জানা যায় না। হিউয়েন সাঙের বর্ণিত বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহার ও আইহোলের দুর্গামন্দির শিখর যুক্ত মন্দিরের দৃষ্টান্ত। দেওগড় ও ভিটারগাঁও-এর মন্দির শিখরযুক্ত মন্দিরের প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যায়। তবে এতে বিতর্ক আছে। যদিও দেওগড়ের মন্দির হয়তো ষষ্ঠ শতাব্দীর কিন্তু ভিটারগাঁও-এর মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত। যদিও অধ্যাপক সরস্বতী এই মন্দিরকে গুপ্তযুগের বলে মনে করেন কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন আদিমধ্য যুগের পূর্বে ভিটারগাঁও-এর মন্দিরের স্থান দেওয়া যায় না। এই দুটি মন্দিরের শিল্প শৈলী ছিল নাগর রীতি। অষ্টম শতাব্দীতে এই রীতি পরিপূর্ণ বিকাশলাভকরেছিল। আর এক নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই রীতি ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় রীতি নামে খ্যাত। এই দুটি রীতিই এযুগের ভারতের মন্দির শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কোণারকের সূর্য মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যে ও শিল্পকীর্তিতে অতুলনীয় ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরগুলির ভাস্কর্যকলাও অপূর্ব। মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা; এমনকি নরনারীর প্রেমও এখানে স্থান পেয়েছে। পুরীর জগন্নাথের সুবিশাল মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। দশম শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল রাজাদের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খাজুরাহোর মন্দির। রাজপুতনার আবু পর্বতের জৈন মন্দিরগুলিও এযুগের স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। খাজুরাহোতে অনেকগুলি শৈব, জৈন ও বৈষ্ণব মন্দির আছে কিন্তু শিল্প বিশেষজ্ঞগণের মতে স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাদেব মন্দির। আবু পাহাড়ের জৈন দিলোয়ার মন্দিরটিও এযুগের স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সব মন্দিরের ভাস্কর্যও শিল্প বিশেষজ্ঞদের মনে বিস্ময় জাগায়। রাজস্থানে আরও অনেক জৈন মন্দির আছে যেগুলির সঙ্গে গুজরাটের শিল্প শৈলীর মিল আছে। গুজরাটের সোলাঙ্কি রাজারা যে বিশাল সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন তার স্থাপত্য আজও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। বঙ্গদেশে এযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন নেই, তবে বঙ্গদেশের স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে গৌড়, পাহাড়পুর, বানগড় ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার মন্দিরগুলি উত্তর ভারতের মন্দিররাজি হতে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সেখানকার মন্দিরগুলি অনেকটা স্থানীয় বাঁশ দিয়ে নির্মিত কুটিরগুলির অনুকরণে নির্মিত। পাহাড়পুরের বিশাল মন্দির ভিন্ন মোটামুটিভাবে অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত অন্য যে মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পাওয়া গেছে স্থাপত্য শিল্পে তাদের রেখ বা শিখর দেউল বলা হয়। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল

ঈষৎ বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। এই শিখর দেউল উত্তর ভারতীয় এবং উড়িষ্যার সাগর রীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ড. সরস্বতী বলেছেন পাহাড়পুরের মন্দির ভদ্র স্থাপত্য রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রেখ রীতির এই মন্দিরগুলির সঙ্গে ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত ভুবনেশ্বরের মন্দিরই ছিল এই মন্দিরগুলির প্রেরণার উৎস। বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্দিরই ছোট। শুধুমাত্র পাহাড়পুর এর ব্যতিক্রম। স্থাপত্য রীতির কোন দুঃসাহসী পরিকল্পনা এখানে পাওয়া যায় না। কৃষি নির্ভর জীবন ও অর্থনীতিতে সেটা করা সম্ভবও ছিল না। তাই স্থাপত্য শিল্প এখানে একটু বিড়ম্বিত হয়েছিল। এই বিড়ম্বনা ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে পড়েছিল। পাল রাজগণের সময় ধীমান ও বীটপালের এবং সেন রাজগণের সময় শূলপাণি নামে শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। তারানাথ লিখেছেন পিতা এবং পুত্র শিল্প ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মতে বীটপাল ধাতব মূর্তিতে প্রাচ্য রীতির এবং ধীমান মধ্যদেশীয় রীতির সূচনা করেন।

দাক্ষিণাত্যেও শিল্প ও স্থাপত্য এযুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে পল্লব রাজ্যে শিল্পের সবিশেষ সমুন্নতি লাভ করেছিল। পল্লব রাজগণ ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তখন কাঞ্চী ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পল্লবরাজগণ অসংখ্য প্রস্তর নির্মিত কারুকার্যময় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি পল্লব রাজগণের আমলেই চালু হয়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন কর্তৃক নির্মিত মহাবলীপুরমের 'সপ্তরথ' মন্দির, কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির ও মামল্লপুরমের রথ মন্দিরগুলি পল্লব স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মামল্লপুরমের মন্দিরগুলির অপূর্ব সুষমা, গঠন সৌষ্ঠব, শিল্পীয় দক্ষতা এমনই যে তাদের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়। কৈলাসনাথের মন্দিরে দ্রাবিড় শিল্পরীতির আভাস পাওয়া যায়। পল্লবদের এই দ্রাবিড় শিল্পরীতি অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য রাজ্যে অনুসৃত হয়েছিল। চালুক্য বংশের রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কৈলাসনাথের মন্দিরের অনুরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। চালুক্য রাজগণের আমলে অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল এবং এলিফেন্টার গুহা মন্দিরগুলিও নির্মিত হয়েছিল। চোল রাজারাও এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। চোল আমলে দ্রাবিড় রীতি আরও পরিণত ও সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে। চোল শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে শিল্পকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের মন্দিরটি চোল শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে। এই মন্দিরের শীর্ষস্থানে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড কীভাবে তোলা হয়েছিল তা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রাজেন্দ্র চোলের 'গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম' নামক নগর এবং নগরের মধ্যে অবস্থিত অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দিরটি চোল স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কুম্ভকোণম মন্দিরের তোরণটি চোল স্থাপত্যের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজন্তা ও এলিফেন্টার কয়েকটি মন্দির চোল শাসনকালেই নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজবংশের ন্যায় রাষ্ট্রকূট রাজারাও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরা পল্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট নরপতি কৃষ্ণ ইলোরার পর্বত কেটে যে কৈলাসনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তা সত্যই অতুলনীয়। এই মন্দিরে 'মহাবলীপুরম' মন্দিরের ভাস্কর্যরীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাদের শিল্প-চাতুর্য ও গঠন পদ্ধতি উত্তর ভারতের শিল্পীদের অনুসৃত রীতি হতে পৃথক। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সংমিশ্রণের ফলে দাক্ষিণাত্যের শিল্প আর্যশিল্প অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে স্থাপত্য শিল্পকলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণেও দক্ষিণ ভারত বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। এই মূর্তিগুলি ভারতীয় শিল্পকলার অমূল্য সম্পদ।

গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে ভারতের শিল্পকলা যে প্রাণশক্তিতে উচ্ছল ও ভরপুর ছিল তার প্রমাণ এই শিল্প ভারতের বাইরে নানা স্থানে প্রসারিত হয়েছিল। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), কম্বোডিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকর্ষ কোথায় পৌঁছেছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া, দেওগড়ের মন্দির, অজন্তা-ইলোরা, মার্লি ও এলিফেন্টা, খাজুরাহো, মহাবলীপুরম, কাঞ্চী, পল্লব ও চোল রাজাদের নির্মিত মন্দির, কর্ণাটকে বেলুড় ও হালোবিদ, মন্দির নগরী উড়িষ্যার কোণারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দির কালের নীরব ঐতিহাসিক সাক্ষী হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে আছে যে, সেযুগেও আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে কী অপরূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আজও শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ এই অপরূপ শিল্পকার্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

এযুগে স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে ভাস্কর্য শিল্পও চরম বিকাশ লাভ করেছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে যে আঞ্চলিকতার উন্মেষ ঘটেছিল তা থেকে ভাস্কর্য শিল্পও মুক্ত হতে পারেনি। ভাস্কর্য শিল্পে আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। পূর্ব ভারতে পাল যুগে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং দাক্ষিণাত্যের পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও চোল ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং দাক্ষিণাত্যের পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও চোল ভাস্কর্য শিল্প সুষমা এযুগের ভাস্কর্যের বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাহাড়পুরের ভাস্কর্য থেকে এটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যকে অনুসরণ করে যেভাবে ভাস্কর্য শিল্পের বিবর্তন শুরু হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে তা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলার ভাস্কর্য শিল্প স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পাল আমলের ভাস্কর্য শিল্পে সাধারণ মানুষের কোন স্থান ছিল না। পাল আমলের ভাস্কর্য শিল্প একান্তই উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভাস্কর্য শিল্পেও ধর্মই প্রধান উৎস ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিই ভাস্কর্যের নিদর্শন। কৃষ্ণের বাল্যকালকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে। আবার সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে সুন্দরী নারী ও নর-নারীর মিথুন মূর্তিও পাওয়া গেছে। তবে রাধাকৃষ্ণের মিথুনমূর্তি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুর ভাস্কর্যে একটি মাত্র বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এযুগে সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এযুগে মৃৎশিল্পও গড়ে উঠেছিল। তবে মূর্তিগুলিতে গুপ্তযুগের শিল্প সুষমা নাই বললেই চলে। পাল ও সেন যুগের সব মূর্তিই কষ্টিপাথরে তৈরি। পিতল ও অষ্ট ধাতুর মূর্তিও পাওয়া গেছে। সোনা-রূপারও দু-একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। কাঠের অলঙ্করণও অজানা ছিল না। তবে নবম শতাব্দীতে অষ্টম শতাব্দীর তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের অগ্রগতি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পিতা-পুত্র ধীমান ও বীটপাল এযুগের ভাস্কর্য শিল্পের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন। দেবপালের সময়ের বিস্ময়কর ধাতু ও প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে নবম শতাব্দীতে এযুগের শিল্পরীতি একটা শিল্পধারার সত্তা অর্জন করে। ভাস্কর্যের পেলবতা ও ভাবালুতা সমগ্র নবম শতাব্দীতে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শিল্পধারা দশম শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় গুপ্ত শিল্পের যে সূক্ষ্মতা ও মসৃণ কারুকার্য পাল যুগের শিল্পে সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রাণশক্তি চার শতাব্দীর ব্যবহারে বিনষ্ট হয়েছিল। আর সেন আমলে শিল্পের সেই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবুও এই পর্বের কোন কোন ভাস্কর্যে, বিশেষ করে দেওপাড়ার গঙ্গামূর্তিতে শিল্পে নব-রূপায়ণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যদিও এযুগের শিল্পীরা শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাচারের নির্দেশ মতো মূর্তি বা মন্দির নির্মাণ করতেন, তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে দেবদেবীর মূর্তিগুলি নির্মিত হলেও শিল্পীর শিল্প-কৌশল ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে এযুগে ভাস্কর্যের সঙ্গে অনেক স্থানেই চিত্রশিল্প মিশে গিয়েছিল। অজন্তা ও ইলোরায় এই ধারণা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। পাল আমলের চিত্রগুলি ক্ষুদ্র। চিত্রগুলিতে ভাস্কর্যের রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এযুগের চিত্রে দেবদেবী ছাড়াও জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছপালা সবেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এছাড়াও, পোড়ামাটির মূর্তি, সূর্যমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের সন্নিকটে অষ্টধাতুর নির্মিত একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি পাওয়া গেছে। এটি এযুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দক্ষিণ ভারতেও পল্লব, চোল ও রাষ্ট্রকূট শাসনকালেও ভাস্কর্যের ও চিত্রকলার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ উত্তর ভারতে ভারুতের উত্থানের প্রায় একশ বছর পূর্বে দক্ষিণ ভারতের শিল্পীগণ ছিলেন ভারতের প্রাচীনতম ভাস্করদের অন্যতম। প্রথম খ্রিস্টাব্দ হতে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে সকল অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত। এমনকি মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত যক্ষ মূর্তিটি উত্তর ভারতে আবিষ্কৃত যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্তি অপেক্ষাও প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মূর্তি ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি। দাক্ষিণাত্যকে ভাস্কর্যের তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। এযুগের পল্লব ভাস্কর্যের ওপর প্রাচীন দাক্ষিণাত্য ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছিল। ভাস্কর্যের মধ্যে মামাল্লপুরমের কিরাতার্জনীয় কাহিনী রূপায়ণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের এই ফলকটি ৯০ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট উঁচু। এতে অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। পাহাড়ের গা কেটে খোদাই করা হয়েছে। এজন্য রিলিফটিকে পাথরের প্রাচীর চিত্র বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। শিল্প সমালোচকরা এটিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলে মনে করেন। জীবজন্তুর মূর্তিগুলিতে গভীর মানবতাবোধের প্রকাশ ও শিল্প সুষমার অভিব্যক্তি মিলিত হয়েছে। তবে পল্লব ভাস্কর্য বেঙ্গীর ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা থেকে মুক্ত। এখানে পুরুষ মূর্তিগুলি যেন নারী মূর্তিগুলি অপেক্ষা বেশি প্রাণবন্ত কিন্তু এই মূর্তিতে অজন্তা ও ইলোরার রহস্যঘন অতীন্দ্রিয়তা ও আলো-ছায়ার খেলা অনুপস্থিত। পল্লব ভাস্কর্যের শেষ দিকে বেঙ্গী ভাস্কর্যের প্রভাব সমধিক। তবে বেঙ্গীর তীব্র ভাবাবেগ পল্লব রীতিতে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত। তথাপি

বেঙ্গীর দেহসৌষ্ঠব, ভঙ্গি, সুষমা পল্লব রীতিতে স্থান পেয়েছে। পল্লব রাজরা যে গুহা শিল্প-কৌশলের প্রবর্তন করেছিলেন তা এককথায় অনবদ্য। গুহা মন্দিরগুলি ৬২৫ হতে ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে কাঞ্চীর মন্দিরগুলি ও মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। মহাবলীপুরমের পঞ্চরথগুলি ছাড়াও অপরাপর গুহামন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ত্রিমূর্তি', 'বরাহ' ও 'দুর্গা'। বরাহমন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত একটি সিংহের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাস্কর্যের দিক থেকে এগুলি অনবদ্য ও অতুলনীয়। আবার গুহামন্দিরে বরাহ অবতার, দুর্গা, সূর্য, লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে। এগুলি চিত্রকলার দিক থেকে শিল্প-সুষমা যুক্ত। দেবদেবী, জীবজন্তু প্রভৃতিকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ পল্লব শিল্পের এক বিশেষ ঐতিহ্য। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দিরে পল্লব রাজগণের ও তাঁর রাণীদের প্রতিচ্ছবি খোদিত আছে। পল্লব শিল্পের একটা বিবর্তন ঘটেছিল। পাহাড় কেটে এইসব নির্মাণ কৌশল গঠন সৌন্দর্য আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাই স্মিথ বলেছেন "The Pallava School of architecture and sculpture is one of the most important and interesting of the Indian School." মামল্লপুরমের অনুপম ভাস্কর্য ভিন্ন, প্রায় অনুরূপ শিল্পের নিদর্শন গুহা মন্দিরের কয়েকটি রিলিফে পাওয়া যায়। এই রিলিফের প্রাণশক্তির পরিচয় মামল্লপুরমের রথগুলির রিলিফে পাওয়া যায় না। সমকালীন ভারতের ভাস্কর্য থেকে মামল্লপুরমের রিলিফের স্থান স্বতন্ত্র।

চোল আমলের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মন্দিরগাত্রে, গোপুরমগুলিতে এবং মন্দির সংক্রান্ত অন্যান্য অট্টালিকাতে পাওয়া যায়। প্রতি মন্দিরের গোপুরমগুলিতে বা তোরণগুলিতে আকাশছোঁয়া এবং সমগ্র গঠনে অলঙ্কারবহুল ভাস্কর্য দেখা যায়। চোলরা ছোট আকারের কিছু পছন্দ করতেন না। তাই চোলদের স্থাপত্য শিল্পেও বিশালতা ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মূল মন্দিরগুলি অপেক্ষা তোরণগুলির খোদিত অসংখ্য মূর্তি অপূর্ব ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। চোল শাসনকালে বহু গুহা মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। অজন্তা ও এলিফেন্টার কয়েকটি গুহা-মন্দির চোল শাসনকালেই নির্মিত। চোল আমলের ভাস্কর্যে পল্লব যুগের ঐতিহ্য জীবন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। চোল আমলের দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য অপরূপভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার অপরূপ ধাতুমূর্তিগুলিতে। ভারতের ধাতুশিল্পে অনুরূপ মূর্তি ভারতে ইতিপূর্বে কখনও নির্মিত হয়নি। তাই ব্যাসাম এর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন সমগ্র পৃথিবীতে এর তুলনা নাই। বিশেষ করে বড় মূর্তিগুলি অনাবৃত মসৃণ শরীর সৌন্দর্যে ও সবলতায় অনুপম। শিল্পশাস্ত্রের বিধান মেনেও কীভাবে তামিল শিল্পীরা মূর্তিগুলিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই আজও বিস্ময়কর। আর চোল ভাস্কর্যের অভূতপূর্ব সৃষ্টি নটরাজ মূর্তিটি। এই নটরাজ মূর্তিটির একটা পা দৈত্যের পিঠে স্থাপিত এবং অপরটি ভারতীয় নৃত্যশিল্পের পরিচিত মুদ্রায় স্থাপিত। এই মূর্তির নির্মাণে তামিল শিল্পীরা একদিকে চঞ্চল প্রবাহের সঙ্গে এক অচঞ্চল শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয়সাধন করেছিলেন। এই নটরাজ মূর্তিটিকে ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হয়। কুমারস্বামীর মতে "সারনাথের বুদ্ধমূর্তি হওয়ার প্রতীক, চোল নটরাজ হয়ে উঠার প্রতীক।"

চালুক্যরাজগণও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাদামির গুহামন্দির, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের মঙ্গলেশ্বর মন্দির চালুক্য শিল্পের নিদর্শন। বাদামির প্রস্তর খচিত মন্দিরগুলিতে দ্রাবিড় শিল্পের আভাস পাওয়া যায়। চালুক্য রাজগণের আমলে অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল এবং এলিফেন্টার কয়েকটি গুহামন্দিরও নির্মিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতেই এযুগে ভাস্কর্য সকল শাসকের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। উড়িষ্যাতেও স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্প কর ও গঙ্গবংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিল। সপ্তম ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সুবর্ণযুগ বলা হয়। ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণারকে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এখানে অসংখ্য মূর্তি আছে যেগুলি ভাস্কর্য শিল্পের চরম নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত। ভুবনেশ্বরে 'রাজ-রাণীর মন্দির', 'মুক্তেশ্বর মন্দির' ও 'পরমেশ্বর মন্দির'গুলি শিল্পকলার চরম নিদর্শন। 'রাজ-রাণী মন্দির টি হলুদ রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। এই শিল্পকলার বিন্যাস অপূর্ব। কোণারকের সূর্য মন্দিরটি ভাস্কর্যের ও স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর শিল্প নৈপুণ্য আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এর নাট-মন্দিরটি বিশাল ও কারুকার্যময়। সোপান শ্রেণীর দুপাশে দুটি সিংহমূর্তি অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এমনকি ললিতগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরি পাহাড়ের গুহাতেও ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য অজন্তা ও ইলোরায় এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে। তবে এখানে উল্লেখ্য চিত্রকলার থেকে এযুগ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে সমুন্নতি লাভ করেছিল। তবে বিভিন্ন চিত্রকলা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। মালবের বাঘ গুহার প্রাচীর চিত্রগুলিও অজন্তার গুহাচিত্রের সমকক্ষ বলে শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাদামি গুহার ভাস্কর্যেও কালের রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাঘ গুহার চিত্রগুলির বর্ণ-সুষমা ও নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিকল্পনায়, বর্ণ-সুষমায় ও বাস্তবীয় বাঘগুহার চিত্রগুলি অতুলনীয়। অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প বিশ্ববন্দিত। কিন্তু শিল্প-সুষমার দিক হতে আদিমধ্য যুগের শিল্প অজন্তা-ইলোরার শিল্পের ন্যায় বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া গুজরাট, কাংড়া, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলেও বহু ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। গুজরাটের চিত্রশিল্পও পূর্ব ভারতের পাল চিত্রশিল্পের মতো 'মিনিয়েচার' চিত্রশিল্প। বিভিন্ন স্থানে এযুগের মন্দির। গাত্রে অসাধারণ যুগ্ম ভাস্কর্যের কাজ দেখা যায়। খাজুরাহোর মন্দিরগুলির ভাস্কর্য শিল্প এক কথায় অসাধারণ। তবে অজন্তার মতো সুষম রং-এর ব্যবহার দেখা যায় না। অজন্তার চিত্রশিল্পের যে সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে চিত্রশিল্পের পরিণত রূপ ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের কাহেরী ও ঔরঙ্গাবাদ চিত্র শিল্পকর্মের কতক চিহ্ন পাওয়া গেছে যা শিল্পকলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

এযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় আঞ্চলিকতার ছাপ যে পড়েছিল তা স্পষ্ট। আবার সব অঞ্চলে একই সময় এবং একইভাবে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেনি। চিত্রশিল্প এযুগে অভিজাত ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কাছে আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। রাজপ্রাসাদ, মন্দির, আরামগৃহের দেওয়াল ও ছাদ চিত্র শোভিত রাখা তখনকার রীতি ছিল। অজন্তা গুহার ছাদ ও দেওয়াল চিত্রাঙ্কন, ইলোরার মন্দিরের ছাদগুলির চিত্রশোভা ও উত্তরপ্রদেশের দশাবতার মন্দিরের ছাদের চিত্রকলার নিদর্শন পৃথিবীর অগণিত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা আজও পেয়ে থাকে। এযুগে ভাস্কর্য শিল্প ছিল প্রধানত ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু নির্ভর শিল্প কিন্তু চিত্রশিল্প ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। আবার ভাস্কর্য ছিল পেশাদারি শিল্পীদের শিল্পকর্ম কিন্তু চিত্রশিল্প ছিল শহর ও গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের লোকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মননশীলতার প্রকাশ। রাজপুত্র, অভিজাতবর্গ, রাজসভার সদস্যগণ, অভিজাত পরিবারের স্ত্রীলোকগণ, এমনকি, নানা প্রকার শিল্প ও বণিক সংঘের সদস্যগণ ও সাধারণ লোক চিত্রশিল্পের অংশীদার ছিলেন। জীবন ও জীবিকার তাগিদে অনেক সময় ভাস্কর্যের চেয়ে শিল্প-সুষমামণ্ডিত পণ্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে পাল আমলের মৃৎশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন চিত্র, দেবদেবীর মূর্তি, এমনকি নর-নারীর মূর্তি নির্মিত হয়েছে এবং এর দ্বারা বহু শিল্পী জীবন ও জীবিকানির্বাহ করেছে। জীবনমুখী শিল্প যে গড়ে . ওঠেনি তা বলা যায় না। এই সময় চিত্রশিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এমন বহু মানুষ ছিলেন, এছাড়া অপেশাদার চিত্রশিল্পীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। অপেশাদার চিত্রশিল্পীগণ চিত্রশিল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন তা বাৎসায়ন উল্লেখ করেছেন। বাৎসায়ন তাঁর কামসূত্রে চিত্রশিল্পকে চৌষট্টীকলার মধ্যে একটি বলে উল্লেখ করেছেন। বাৎসায়নের ভাষ্যকার যশোধর অপেশাদার চিত্রশিল্পীগণ যেসব বিষয়ে সে যুগে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন তা কুমারস্বামী অনুবাদ করেছেন। তবে আদিমধ্য যুগে চিত্রশিল্প পূর্ণতালাভ করেনি, পূর্ণতা লাভ করেছিল পরবর্তীকালে। যদিও এযুগ ছিল স্বাতন্ত্র্যের যুগ, তা সত্ত্বেও এযুগের শিল্পসাধনায় একটা মূলগত ঐক্য ছিল।

আদি মধ্যযুগে মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা(Coins and monetary systems in the early mediaeval period Coins and monetary systems in the early Middle Ages)

গুপ্ত যুগের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি প্রমাণ দেয় যে, বাণিজ্যই ছিল এযুগের প্রধান উৎস। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে গুপ্তরা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এবং ভারতে অত্যন্ত উন্নতমানের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করলেও তাঁদের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যের বাকাটক বংশীয় রাজাদের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। অথচ বাকাটকদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক ক্ষত্রপরা মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। স্বভাবতই ড. রামশরণ শর্মা বাকাটকদের এই মুদ্রারহিত অর্থনীতিকে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবক্ষয়ের প্রতীক বলে মনে করেন। ড. রামশরণ শর্মা মনে করেন গুপ্তযুগে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল রোমান বণিকদের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র। রোমান বাণিজ্য-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলেই ভারতের এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে সম্পর্কিত অঞ্চলের বাণিজ্যও লোপ পায়। নগরকেন্দ্র, বণিক-নাগরিক শ্রেণী, শিল্প উৎপাদন ও মুদ্রাভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা ও যাদব মনে করেন এযুগে বাণিজ্যের ক্রমাবনতিতেই নগরের অবক্ষয় ও মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়। তাঁরা যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন যে পাল-সেন-চন্দ্রবর্মণ রাজাদের শিলালিপিতে পূর্বের মতো 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' ও 'কুলিক' শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, গঙ্গাবন্দর-তাম্রলিপ্তির অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিলোপ এবং পাল ও সেন রাজাদের আমলে তৈরি মুদ্রার চূড়ান্ত দুষ্প্রাপ্যতা। অর্থাৎ পাল-সেন রাজাদের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সম্ভবত রাঢ়, গৌড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলেই বোধহয় এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। অন্যত্র মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ছিল না। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিক এই তথ্য দিয়েছেন।

কারণ ময়নামতী-লালমাই কেন্দ্রিক দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ব্যতিক্রমধর্মী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে খননের ফলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা অনেকগুলি নগর-কেন্দ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া মুদ্রাভিত্তিক অর্থলাভের উপর নির্ভরশীল বৈদেশিক বাণিজ্যও যে এই অঞ্চলে শত শত বছর ধরে চলে আসছিল, তার প্রমাণ এই অঞ্চলেই সাম্প্রতিক কালে গুপ্ত মুদ্রা, নকল গুপ্ত মুদ্রা, বৃষ ও ত্রিশূলের প্রতীকযুক্ত মুদ্রা ও দিনার ও দিরহামের আবিষ্কার। পট্টিকেরা, দেবপর্বত ও চট্টগ্রামের রামুর নিকটবর্তী কোন বন্দরই ছিল বোধ হয় গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলিম আগমন পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সময় উত্তর ভারতে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলিত নাম 'পুরাণ', 'ধরন', 'কার্যাপণ' ও 'দ্রম্ম'। তাছাড়া 'সমন্দর' বা 'সুদকাওয়ান' বন্দর যা ঐতিহাসিকগণ চট্টগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন তা এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এই বন্দর আরব বণিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুসলিম আগমন পর্যন্ত এখানে যে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। তবে ড. শর্মার বক্তব্য ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে গুপ্ত মুদ্রার সাক্ষ্য মিললেও ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে ভারতীয় রাজাদের মুদ্রা ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস পায়। তবে উপরিউক্ত তথ্যের দ্বারা মুদ্রার স্বল্পতা বা অনুপস্থিতি সমর্থিত হয় না। বরং সপ্তম হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুদ্রার ধারাবাহিক ব্যবহারে সজীব বাণিজ্যের চিত্রই পাওয়া যায়। যদিও দশম শতাব্দীতে মুদ্রাগুলির আকার ও ওজনের পরিবর্তন ঘটেছিল। কারণ এই সময়ের লেখমালায় ৩২ রতি বা ৫৭.৫ গ্রেন বিশিষ্ট ওজনের মুদ্রাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুদ্রার ওজনের এই পরিবর্তনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে হরিকেলীয় মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন রৌপ্য মুদ্রাগুলিকে উত্তর ভারতের প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রাগুলির সঙ্গে ওজনের দিক দিয়ে বিনিময়যোগ্য করে তোলে।

আবার পাল-সেন রাজাদের আমলের মুদ্রা পাওয়া না গেলেও বহু তাম্রশাসনে 'পুরাণ কপর্দক' বা কড়ি ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন যে গুপ্তযুগের পরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস পায়নি এবং মুদ্রার পরিমাণও বিশেষ হ্রাস পায়নি। মুদ্রা যেটুকু কমেছিল কড়ি তার ক্ষতিপুরণ করেছিল। ফলে পাল-সেন শাসিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুদ্রা না থাকলেও তা বাণিজ্যের পরিপন্থী ছিল না। যদিও বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ কড়ির বহন ক্ষমতা ভ্রাম্যমাণ বণিকদের পক্ষে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি নিশ্চয়ই করেছিল। তাই

বিকল্প মুদ্রার কথাও ভেবেছিল। এরকম একটি বস্তু বিনিময়ের কাজে ব্যবহৃত হত তার নাম 'চূর্ণী'। এখন চূর্ণী কী তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে উত্তর ভারতের রৌপ্যমুদ্রাগুলির বিশুদ্ধতা যখন সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না এবং কড়ি বহনের পক্ষে বিরাট অসুবিধাজনক তখন 'চূর্ণী' বা সোনার গুঁড়ো বা রৌপ্য গুঁড়ো (সোনার বা রৌপ্য খণ্ড) দূরপাল্লার বাণিজ্যের কাজে ব্যবহারের পক্ষে ছিল আদর্শ স্থানীয়। আরব বণিকদের বিবরণে 'চূর্ণী'র কথা উল্লেখিত হয়েছে। আরব বিবরণে এ তথ্যও জানা যায় যে গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যে ধাতব চূর্ণ দিয়ে ব্যবসা চলত। সুতরাং মুদ্রা একেবারে হ্রাস পেয়েছিল এ তথ্য যথার্থ নয়। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে যে 'monetary anaemia' তত্ত্বের উদ্ভাবন করা হয়েছে' তা এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত মেনে নেওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারতেও মুদ্রা অপ্রচলিত ছিল না। বাকাটকদের মুদ্রা পাওয়া না গেলেও তাদের প্রতিবেশী শক-ক্ষত্রপরা মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ভারতের চোল, চালুক্য ও পাণ্ড্যদের মুদ্রার আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই আদিমধ্য যুগে ভারতের সর্বত্র কোন না কোন সময় মুদ্রাব্যবস্থা কম-বেশি চালু ছিল। মুদ্রাই ছিল বিনিময় প্রথার মাধ্যম। যদিও পাল-সেন আমলের মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতিকে একটি অবোধ সমস্যা বলেই মনে করা হয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাল-সেন আমলের বাংলার জীবন ছিল পণ্য বিনিময় প্রথার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। তবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের খননকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের ও গুপ্তযুগের পরবর্তীকালের ৩৫০টিরও বেশি মুদ্রা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে এই অঞ্চলে একটি পরিবর্তনশীল, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু ছিল। মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতির ফলে কড়িই একমাত্র বিনিময় মাধ্যম হিসাবে বাংলায় চালু হয়েছিল-সম্ভবত একথা আর বলা যায় না। গুপ্তদের মুদ্রাব্যবস্থায় ধাতুর বিশুদ্ধতা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বেশ কিছুদিন টিকে ছিল। আর এই মুদ্রাব্যবস্থায় বাংলার অংশ ছিল। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে এদেশের কোন কোন অঞ্চলের রাজারা এক ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন যা সাধারণত 'নকল গুপ্ত মুদ্রা' রূপে পরিচিত। গুপ্তকালীন মুদ্রারীতির সঙ্গে এই মুদ্রাগুলির সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য ছিল কিন্তু ধাতুর বিশুদ্ধতার দিক থেকে এগুলির অবক্ষয় ঘটেছিল। একথা বিশ্বাস করা হত যে, এই নকল গুপ্ত মুদ্রাগুলি ছয় ও সাত দশকে তৈরি করা হয়েছিল এবং স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোন ধাতু দিয়ে এই শ্রেণীর মুদ্রাগুলি তৈরি হয়নি। ময়নামতীর আবিষ্কার থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাংলার নকল মুদ্রারীতি আরো দীর্ঘকাল ধরে চালু ছিল এবং এ জাতীয় মুদ্রার মধ্যে তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রাও আছে। নকল গুপ্ত Archer-type-এর একটি বিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রার ঐতিহ্য আট শতকেও খুব সম্ভব দেব রাজাদের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অনুসৃত হয়েছিল। ময়নামতীতে প্রাপ্ত অধিকাংশ মুদ্রায় ষাঁড় ও ত্রিশূলের চিত্র আঁকা আছে। মনে করা হয় যে, এই মুদ্রাগুলির অঙ্কনের সময়কাল আট থেকে নয় শতকের মধ্যে পড়ে। এ অভিমত প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন আরাকানের মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই মুদ্রাগুলি হরিকেল-সমতট-বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় শাসকগণ, যাদের রাজত্বকাল দশ থেকে এগারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত, তাঁরা চালু করেছিলেন।

তবে লালমাই খননকার্যের তৃতীয় যুগের পর্যায়ে প্রাপ্ত অদ্বিতীয় ধরনের স্বর্ণ মুদ্রাটি রীতির দিক দিয়ে নিখুঁত এবং এর প্রথম পীঠে লেখা আছেঃ 'শ্রী বঙ্গাল-মৃগাঙ্কস্য' এই মুদ্রাটিকে আদিরূপ বা মডেল হিসাবে গ্রহণ করে আট এবং বোধহয় নয় শতকেও এটির অনুকরণে আরো মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিল। মুদ্রাটি নকল গুপ্ত Archer-type শ্রেণী, এতে করে এ অনুমান যথার্থ যে, দেব বংশের শাসকগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য চালু রেখেছিলেন। অত্যন্ত পুরানো ঐতিহ্য থেকে ঐযুগে মারাত্মক রকমের বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল, এরকম অনুমানের আশ্রয় যদি আমরা না গ্রহণ করি তাহলে মুদ্রাতত্ত্বের উক্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির কারণেই আমরা ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলিকে আট-নয় শতকের সময়সীমার মধ্যে ফেলতে পারব না। এই ধরনের স্বর্ণমুদ্রা এবং ষাঁড় ও ত্রিশূলের প্রতীক খচিত স্বর্ণমুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে, রৌপ্যের সঙ্গে তুলনায় স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। লালমাই পাহাড়ে অধিক সংখ্যায় ষাঁড় ও ত্রিশূল যুক্ত যে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে, সেই মুদ্রাগুলি চালু করা হয়েছিল স্বর্ণমুদ্রার অভাব পূরণ করে লেনদেনের নিম্নমানের একটি মাধ্যমকে দেশের ঘটনাটির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। যে চন্দ্ররাজগণ আরাকান থেকে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে এসেছিলেন সম্ভবত তাঁরাই উপরোক্ত নতুন

শ্রেণীর মুদ্রা এদেশে চালু করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন এদেশে নবাগত সেইজন্য এ দেশের প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থা বা মুদ্রার ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের বিশেষ কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়, তাঁদের আদি বাসভূমি আরাকানে প্রচলিত মুদ্রায় যে সকল প্রতীক চিহ্ন চালু ছিল তারই অনুকরণ করা তাঁদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজাদের ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলি আরাকানের চন্দ্ররাজবংশের (৭৮৮-৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) একটি বিশেষ শ্রেণীর মুদ্রার সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিল থাকায় এই অভিমত নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ষাঁড় ও ত্রিশূলের চিহ্নধারী এই রৌপ্যমুদ্রাগুলির খুঁটিনাটি উপাদানে বিভিন্নতা ও তাদের মোটিভের ক্রমিক অবনতি এই ইঙ্গিত দেয় যে, এগুলি দীর্ঘসময় ধরে অঙ্কিত হয়ে আসছিল। প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, এই চন্দ্ররাজগণই একটি স্থিতিশীল আমলাতন্ত্রও গড়ে তুলেছিলেন।

প্রাক্-মুসলিম যুগের এদেশের মুদ্রাব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার পর একথা বলা যেতে পারে যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ ছয় শতক থেকে শুরু করে প্রায় এগারো শতক পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে মুদ্রা অঙ্কন করেছিলেন। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর যে পাল-সেন রাজগণ শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁরা বোধহয় মানসম্পন্ন কোন মুদ্রাব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করেননি। মুদ্রাতাত্ত্বিক উপকরণগুলি এক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করছে তা বোধহয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইওরোপের সঙ্গে গুপ্ত যুগের বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও এই সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার স্বাক্ষর বাংলার সেই বাণিজ্যিক সম্পর্কে বোধহয় ছেদ টেনে দিয়েছিল। এরই ফলে সম্ভবত তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবক্ষয় ঘটেছিল। এই ঘটনার ফলে শিল্প-উৎপাদন, নগরকেন্দ্র ও মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুব সম্ভব এদেশে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং তাতে করে এ দেশের সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভীষণভাবে বদলে গিয়েছিল। টাকা-পয়সার হিসাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য বোধহয় কোন মানসম্পন্ন মুদ্রা প্রচলনের আর প্রয়োজন ছিল না। দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল হয় অনুপস্থিত, নয়তো ভাঁটা পড়েছিল। সেইজন্য পণ্য-বিনিময় প্রথা অথবা কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবে চালু হয়েছিল। তাই এই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থানকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'monetary anaemia' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ এদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রাব্যবস্থাকে চালু রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তার প্রমাণ ময়নামতী খননকার্যের তৃতীয় পর্যায়ের উপরের স্তরে খালিফা মুসতামিন বিল্লাহর (১২৪২-৫৮ খ্রিস্টাব্দ) একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ যে কয়টি আব্বাসীয় রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে তা এই অঞ্চলের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকার জোরালো ইঙ্গিত বহন করে। মুদ্রাব্যবস্থার এই জটিল বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করলে দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষে একই সময়, একইভাবে মুদ্রার অস্তিত্ব দেখা যায় না। কোন কোন অঞ্চলে দেশের মুদ্রাব্যবস্থা বিনিময় প্রথার স্থান গ্রহণ করলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সে যুগে সব অঞ্চলে একই সময়, একইভাবে মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি ব্যাপকতা অর্জন করতে পারেনি।

আদিমধ্য যুগে নগরায়ণের প্রকৃতি(The nature of urbanization in the early Middle Period)

ভারতে নগরায়ণের সূচনা বিশ্বসভ্যতা বিকাশের অতি প্রত্যুষকাল হতে। আজও সে ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যায়নি। সুপ্রাচীনকাল হতে ভারতের নগরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল একবার উত্থান, একবার পতন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর পর কত নগরের উত্থান ও পতন ঘটেছে তা এই স্বল্পপরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। আর সেই ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া অসম্ভব। আদিমধ্য যুগেও নগরায়ণের প্রকৃতিতে উত্থান ও পতনের তথ্য পাওয়া যায়। স্বভাবতই এখানেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সূচনা হয়। এই যুগকে অর্থাৎ ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালকে ড. রামশরণ শর্মা নগরায়ণের তথা সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে তিনি এযুগকে 'সামন্ততন্ত্রের' বিকাশের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে এযুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে নগরায়ণের প্রকৃতিতে চরম অবক্ষয় দেখা দেয়। তাঁর মতে এযুগে নগরায়ণের অবক্ষয়ের প্রধান কারণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয়। কিন্তু ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, চম্পকলক্ষ্মী এযুগের এক সজীব ও সৃজনশীল জীবন্ত অথনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় লেখমালার ভিত্তিতে উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরের অবক্ষয়ের কথা যেমন মেনে নিয়েছেন, তেমনি উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরের অস্তিত্ব যে একই সময়ে টিকে ছিল তা তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিয়ে দেখিয়েছেন। আদিমধ্য যুগে তিনি নগরায়ণের প্রকৃতিতে সার্বিক অবক্ষয়কে স্বীকার করেননি। এমনকি ড. শর্মা আদিমধ্য যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সার্বিক নগরায়ণের অবক্ষয় দেখিয়েছেন ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তাও স্বীকার করেননি। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে এযুগে যেমন বিখ্যাত কয়েকটি নগর অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, আবার এযুগে অহিচ্ছত্র, দিল্লির পুরানো কিল্লা, উত্তরপ্রদেশের অত্রাঞ্জীখেড়া, বারাণসীর নিকটস্থ রাজঘাট, বিহারের চিরন্দ, হরিয়ানার পেহোয়া, গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত তত্ত্বানন্দপুর প্রভৃতি প্রধান নগর নগরসুলভ আকার ও চরিত্র ধারণ করে বলিষ্ঠভাবেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এমনকি শতপথ ব্রাহ্মণেও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। স্বভাবতই বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই বহু বন্দর গড়ে ওঠে। এগুলি নগরের চরিত্র অর্জন করে। এরকম নগর-বন্দরের বহু পরিচয় রাষ্ট্রকূট রাজাদের শিলাপট্ট থেকে দেখা যায় যে, ভৃগুকচ্ছ বা ভারুচ এবং কল্যাণ থেকে তারা মোটা শুল্ক পেত। আরব পর্যটক অল্-ইদ্রিসের মতে, দশম শতকে চীন ও ইরান থেকে বাণিজ্য জাহাজগুলি ভৃগুকচ্ছে আসত। রাষ্ট্রকূট শক্তির পতনের পর ভৃগুকচ্ছের খ্যাতি হ্রাস পায়। এর স্থলে ক্যাম্বে বন্দরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। গুর্জর-প্রতিহার রাজা ছিলেন ক্যাম্বে বন্দরের অধিকর্তা। ষোড়শ শতক পর্যন্ত ক্যাম্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানে উল্লেখ্য নগরায়ণের প্রকৃতিতে দেখা যায় যে প্রাচীন যুগ থেকে বিখ্যাত নগরগুলি তীর্থস্থান, নদী বা বাণিজ্যপথের ধারে গড়ে ওঠে। ইওরোপেও দেখা যায় খ্রিস্টীয় গীর্জা এবং শহর নদী বা পুলের ধারে গড়ে ওঠে। ভারতের ক্ষেত্রেও নগরায়ণের প্রকৃতিতে একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আদিমধ্য যুগেও নগরায়ণের প্রকৃতিতে দেখা যায় তীর্থস্থান, শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই নগরের বিকাশ হয়। কারণ এযুগে যে কৃষি ও বাণিজ্য সজীব ছিল সে তথ্য ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকলক্ষ্মী আমাদের জানিয়েছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় হরিয়ানার পেহোয়া নগরের যে অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন তা উত্তরাপথের একটি উল্লেখযোগ্য অশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। গাঙ্গেয় নগরগুলি যে টিকেছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সাক্ষ্য দিয়ে তিনি দেখাতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি শহর তত্ত্বানন্দপুরে যে বাজার, দোকান, রাস্তা, বাসগৃহ সহ তার পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। নগরের আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাহল সীয়াডোনি। এখানে একটি লেখ পাওয়া গেছে। লেখটিতে ৯০৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। এই নগরটি প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নগরটি লবণ ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। নগরটির মধ্যে হট্ট বা একাধিক বাজার, বাসগৃহ ও রাস্তার ধারে কারিগর ও ব্যবসায়ীর বসবাস ছিল। নগরটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়াও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করেছিল। আবার গুর্জর-প্রতিহারদের রাজ্যে একটি নগর অবস্থিত ছিল তার নাম গোপাদ্রি বা আধুনিক গোয়ালিয়র। এই নগরে শ্রেণী, সার্থবাহ ও তৈল উৎপাদকরা বাস করত। নগরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাই এই নগরটি 'কেল্লা'

হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এই শহরের সামরিক গুরুত্ব ছিল। একজন 'নগরপাল' এই নগর শাসন করতেন। প্রতিহার শাসকরা তাঁকে নিযুক্ত করতেন। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন সীয়াডোনি, তত্ত্বানন্দপুর ও গোপাদ্রি নগর হিসাবে সবথেকে পরিণত ও বিকশিত হয়েছিল।

তাই দেখা যায়, ড. শর্মা তাঁর Urban Decay In India নামক গ্রন্থে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নগরের অবক্ষয়ের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা আংশিক সত্য হলেও, সার্বিক অবক্ষয় নয়। নগর জীবনের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের এযুগেরও তথ্য সমৃদ্ধ প্রমাণ আছে। ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে নগরায়ণের ধারা ভারতে অবলুপ্ত হয়নি কখনও। ১০০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেও শিল্প, বাণিজ্য ও নগরায়ণ অব্যাহত ছিল। চীনাংশুক বা চীনের রেশমের প্রাচুর্য ভারতীয় বাজারে ছিল। আদি ঐতিহাসিক যুগের নগর উজ্জয়িনী ও বারাণসী নগর তখনও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। বাণগড় ও পাটলিপুত্রের আদিমধ্য যুগেও তার অস্তিত্ব ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণেও বেশ কয়েকটি জাঁকজমকপূর্ণ নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে প্রয়াগ ও কনৌজের কথা তিনি বার বার বলেছেন।

এসময় দক্ষিণ ভারতে ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও নগরায়ণের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশে কলচুরি রাজারা নগরায়ণের প্রক্রিয়া ঘটিয়েছিলেন। ড. চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় লক্ষ্মণরাজের একটি লেখ হতে 'পুরপত্তন'-এর কথা জানিয়েছেন। বিলহরি ও কারিতলাই শহর দুটি লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এখানে কৃষিপণ্য কেনাবেচা হত। ড. চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন কৃষি সমৃদ্ধি কীভাবে একটি গ্রাম শহরে পরিণত হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রাজস্থানের নাডোল। প্রকৃতপক্ষে নড্ডল ছিল একটি গ্রাম। মাঙ্গলিক বাণিজ্যের লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে নড্ডল গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করায় মণ্ডপিকা গড়ে ওঠে এবং ক্রমেই নড্ডল গ্রামটি নাডোল নামে নগরে পরিণত হয়। নাডোল বাণিজ্যকেন্দ্র ও চহমানা রাজাদের সদর দপ্তরে পরিণত হয়।

ড. রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন এই বাণিজ্যের প্রসার ও কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি দ্রব্যের লেনদেন দাক্ষিণাত্যের নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিশেষ করে কর্ণাটকের প্রাচীন বেণুগ্রাম বা বেলগাঁও বাণিজ্যের লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করায় ও বণিকের আগমন ঘটায় নগরের আকার ও চরিত্র অর্জন করে। দক্ষিণ ভারতে চোলরা যে বাণিজ্য খ্যাতি অর্জন করেছিল তা যে সর্বজন স্বীকৃত তা চম্পকলক্ষ্মী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে চোল ভূখণ্ডে কুড়ামুকু ও পালাইয়ারাই যুগ্ম নগর হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল। এই নগরদুটির যুগ্মভাবে বিকাশলাভের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করায় এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় মন্দিরগুলির বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের চাহিদা থাকায় পণ্যসামগ্রী নিয়ে বহু বণিকের আগমন ঘটায় নগরায়ণের প্রক্রিয়া এখানে বিকশিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শহরে বণিক ও কারিগররা বসতি স্থাপন করে এবং নগরায়ণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। আদিমধ্য যুগের বাংলাতে প্রাচীন নগরের সাথে সাথে নতুন নগর যে গড়ে ওঠে তার অনেক তথ্য পাওয়া যায় এযুগের সাহিত্য ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর লেখা রামচরিতে রামাবতী নামক এক নগরীর উল্লেখ করেছেন এবং রামাবতীকে তিনি অমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমনকি রামাবতীকে 'দেবতাদের নগর' বলা হয়েছে। বরেন্দ্রী ও রাঢ় বাংলার নগরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এযুগের সাহিত্যে। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় বাণগড়ে প্রাপ্ত পাল-সেন যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের স্তরগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে নগরায়ণের প্রতি এযুগে নতুন জোয়ার এসেছিল। বাণগড় অবস্থিত ছিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী নদীর মধ্যস্থলে। আর একটি বরেন্দ্রীর উল্লেখযোগ্য নগরের সন্ধান পাওয়া যায় তাহল মহাস্থানগড়, এটি পুণ্ড্রনগর নামে পরিচিত। মহাস্থানগড়ের অবস্থান ছিল সম্ভবত বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে। এছাড়া পাহাড়পুর ছিল রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের সময় এটি সোমপুর নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। অবশ্য তারপর এগুলির অবক্ষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নগরায়ণের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আদিমধ্য যুগে নগরের অবক্ষয়ের সাথে অনেক স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকে কেন্দ্র করে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল। ড. শর্মা যে আদিমধ্য যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ণের অবক্ষয়ের তত্ত্ব খাড়া করেছেন তা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দ্বারা ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, চম্পকলক্ষ্মী বিরোধিতা করেছেন এবং কীভাবে অবক্ষয়ের সাথে সাথে নতুনভাবে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল তা দেখিয়েছেন। আর ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ভারতে যে দ্রুত নগরায়ণের সূচনা হয় তাও দেখিয়েছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় এই নগরায়ণকে তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ বলে অভিহিত করেছেন। উত্তর ও মধ্য ভারতে এর আগেই পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশ ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।দ্রুত নগরায়ণের সূচনা হয় তাও দেখিয়েছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় এই নগরায়ণকে তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ বলে অভিহিত করেছেন। উত্তর ও মধ্য ভারতে এর আগেই পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশ ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তৃতীয় পর্যায়ের এই নগরায়ণ স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে বিকাশলাভ করেছিল। এই তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণে স্থানীয় শাসকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের মূল কেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় মালভূমি অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের নগরায়ণকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ভারতে নগরায়ণের সূচনা হয়। কিন্তু ড. রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন আদিমধ্য যুগে তৃতীয় দফায় যে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল তার কোন মূল কেন্দ্র ছিল না। দ্বিতীয় পর্বের নগরগুলি প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও কৃষি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের নগরগুলি বেশিরভাগই বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ ছিল। তাঁর মতে এইসব অঞ্চলে যে সমস্ত আঞ্চলিক শাসকস্বৈরীর উত্থান ঘটেছিল তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ের এই নগরগুলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নগরগুলি বিকাশলাভ করেছিল স্থানীয় শক্তির ভরকেন্দ্র হিসাবে। ড. চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর মালবে ২০টি, গুর্জর চালুক্যদের অধীনে গুজরাটে ১৩১টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭০টি ও কর্ণাটকে ১৭টি নগরের অস্তিত্ব ছিল। দাক্ষিণাত্যে এযুগে কয়েকটি খ্যাতিমান নগরের সূচনা হয়েছিল। বাতাপি চালুক্য রাজাদের রাজধানী ছিল। কাঞ্চী ছিল পল্লব রাজাদের বিখ্যাত নগর ও রাজধানী। মহাবলীপুরম ছিল তামিলনাড়ুতে অবস্থিত নগর-বন্দর। তাঞ্জোর হল চোল রাজাদের রাজধানী এবং তামিলনাড়ুর এক প্রাচীন নগর। এ থেকে দাক্ষিণাত্যেও নগরায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. চট্টোপাধ্যায় আরও কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বিবরণ দাক্ষিণাত্যের মুদ্রা সহ দিয়েছেন। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে ড. শর্মা আদিমধ্য যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবক্ষয় ও মুদ্রার সঙ্কটকে কেন্দ্র করে যে নগরায়ণের অবক্ষয়ের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। পাল-সেন যুগের মুদ্রা পাওয়া না গেলেও অন্যত্র মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ছিল না। মুদ্রার যেটুকু অভাব ছিল কড়ি সেই স্থান গ্রহণ করেছিল। তাই বলা যায় আদিমধ্য যুগে নগরায়ণ অব্যাহত ছিল এবং আদি ঐতিহাসিক যুগের বহু নগরীর অস্তিত্ব আদিমধ্য যুগেও বর্তমান ছিল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লির সুলতানি শাসনকালে নতুন নতুন নাগরিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই নগরায়ণের শীর্ষে ছিল দিল্লি নগরী। দিল্লি কনস্ট্যান্টিনোপল, কায়রো ও বাগদাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। দিল্লির সেই মর্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে নগর জীবনের সূত্রপাত ঘটে তা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়। এসময় সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে, শিল্প ও কারিগরিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

তৃতীয় পর্যায়ের এই নগরায়ণ স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে বিকাশলাভ করেছিল। এই তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণে স্থানীয় শাসকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের মূল কেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় মালভূমি অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের নগরায়ণকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ভারতে নগরায়ণের সূচনা হয়। কিন্তু ড. রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন আদিমধ্য যুগে তৃতীয় দফায় যে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল তার কোন মূল কেন্দ্র ছিল না। দ্বিতীয় পর্বের নগরগুলি প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও কৃষি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের নগরগুলি বেশিরভাগই বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ ছিল। তাঁর মতে এইসব অঞ্চলে যে সমস্ত আঞ্চলিক

শাসকস্বৈরীর উত্থান ঘটেছিল তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ের এই নগরগুলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নগরগুলি বিকাশলাভ করেছিল স্থানীয় শক্তির ভরকেন্দ্র হিসাবে। ড. চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর মালবে ২০টি, গুর্জর চালুক্যদের অধীনে গুজরাটে ১৩১টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭০টি ও কর্ণাটকে ১৭টি নগরের অস্তিত্ব ছিল। দাক্ষিণাত্যে এযুগে কয়েকটি খ্যাতিমান নগরের সূচনা হয়েছিল। বাতাপি চালুক্য রাজাদের রাজধানী ছিল। কাঞ্চী ছিল পল্লব রাজাদের বিখ্যাত নগর ও রাজধানী। মহাবলীপুরম ছিল তামিলনাড়ুতে অবস্থিত নগর-বন্দর। তাঞ্জোর হল চোল রাজাদের রাজধানী এবং তামিলনাড়ুর এক প্রাচীন নগর। এ থেকে দাক্ষিণাত্যেও নগরায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. চট্টোপাধ্যায় আরও কৃষিপণ্যের বিস্তৃত বিবরণ দাক্ষিণাত্যের মুদ্রা সহ দিয়েছেন। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে ড. শর্মা আদিমধ্য যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবক্ষয় ও মুদ্রার সঙ্কটকে কেন্দ্র করে যে নগরায়ণের অবক্ষয়ের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। পাল-সেন যুগের মুদ্রা পাওয়া না গেলেও অন্যত্র মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ছিল না। মুদ্রার যেটুকু অভাব ছিল কড়ি সেই স্থান গ্রহণ করেছিল। তাই বলা যায় আদিমধ্য যুগে নগরায়ণ অব্যাহত ছিল এবং আদি ঐতিহাসিক যুগের বহু নগরীর অস্তিত্ব আদিমধ্য যুগেও বর্তমান ছিল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লির সুলতানি শাসনকালে নতুন নতুন নাগরিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই নগরায়ণের শীর্ষে ছিল দিল্লি নগরী। দিল্লি কনস্ট্যান্টিনোপল, কায়রো ও বাগদাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। দিল্লির সেই মর্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে নগর জীবনের সূত্রপাত ঘটে তা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়। এসময় সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে, শিল্প ও কারিগরিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

আদিমধ্য যুগে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য(Internal and external trade in the early Mediaeval period.)

আদিমধ্য যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও ড. শর্মা ও যাদব এযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের তত্ত্ব তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের জন্য নগরগুলির অবক্ষয় ঘটেছিল। কিন্তু আদিমধ্য যুগের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় এযুগে (৬৫০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) অর্থনৈতিক চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটেছিল এ তত্ত্ব আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম গবেষক ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকলক্ষ্মী মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে আদিমধ্য যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল কিন্তু বাণিজ্য নির্ভর নগরাশ্রয়ী অর্থনীতির অবসান ঘটেনি। তাঁদের ব্যাখ্যায় এযুগের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিবর্তে এক সজীব ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক চিত্রই পাওয়া যায়। এযুগে সামন্ততন্ত্রের অভিঘাতে যাঁরা অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট দেখেন তাঁদের মতে দেশীয় ও দূরপাল্লার বাণিজ্যের সঙ্কোচন ঘটেছিল। কিন্তু আগেই বলেছি ড. চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকলক্ষ্মী এই মতের চরম বিরোধিতা করেছেন। এখন সাম্প্রতিক তথ্য ও গবেষণার আলোকে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত বাণিজ্যিক চরিত্র কেমন ছিল।

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে যে শিল্পে ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল তা বহু তথ্য থেকে আমরা জেনেছি। এমনকি শতপথ ব্রাহ্মণেও সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস থেকেও ইওরোপের সঙ্গে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এক বাণিজ্যধারার বিবরণ পাই। গুপ্তযুগে নির্মিত মেহেরুলি পিলার (দিল্লিতে কুতুবমিনারের সন্নিকটে অবস্থিত) অর্থাৎ এই লৌহ স্তম্ভটি প্রমাণ দেয় ভারতে সে যুগে লৌহশিল্পে কী অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছিল। বাণিজ্যকে যে ভারত বরাবর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে সে তথ্য পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে, তাম্রশাসনে ও বৈদেশিক বিবরণে। আদিমধ্য যুগে মানুষ কৃষিতে আত্মনিয়োগ করলেও বাণিজ্য কখনও অবহেলিত ছিল না। এযুগে দেশীয় বাণিজ্যে বহু প্রকার বাণিজ্যকেন্দ্রের উত্থান ঘটেছিল তা বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যায়। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ছোট, বড় ও মাঝারি নানা প্রকারের ছিল। সাহিত্যে ও তাম্রশাসনে 'হট্ট' ও 'হট্টিকা'র ব্যবহার এযুগে ব্যাপক দেখা যায়। এগুলি আজকের গ্রামের 'হাট' বা সপ্তাহে দুবার বা তিনবার বসে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি গ্রামীণ ক্ষুদ্র বাজার বা হাট। দক্ষিণ ভারতে তেলেগু লেখতে দেখা যায় অড্ড। এটিও অন্ধ্র এলাকার গ্রামীণ বাজার বা হাট। ড. রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন সংস্কৃতে অন্যসূত্রে 'যাত্রা' নামক যে এলাকা বর্ণিত তা নিশ্চয়ই কোন কাল্পনিক ঘটনা নয়। এটির অর্থ মেলা ও মেলা চলাকালীন বাজার। উত্তর ভারতে যে মেলা 'যাত্রা' বলে অভিহিত, তার সমতুল্য মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে 'সন্থে'। হাটের মতোই 'যাত্রা' বা 'সন্থে'তে নিত্য ও নিয়মিত বেচাকেনা চলে না। তার বৈশিষ্ট্য সাময়িক। মেলাগুলি কোন নির্দিষ্ট দিনে বসত না। উৎসব, অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় পরব ইত্যাদির সঙ্গে মেলা বসার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মেলাগুলিতে লেনদেন হত দীর্ঘদিন ধরে। বিশেষ কোন ঋতুতে অথবা কোন বিশেষ মাসে বা কোন ধর্মীয় উৎসবকালে মেলা বসত। নবম শতকের রাজস্থানের লেখতে 'কম্বলা হট্ট' বা ঘোড়া বেচাকেনার মেলা বসত। জীবজন্তু বেচাকেনার মেলা বছরের নির্দিষ্ট দিনে বসত। ওখানে গরু, মোষ, ষাঁড়, ঘোড়া, উট ইত্যাদির বেচাকেনা হত। পুরানো পশু বেচা বা নতুন পশু কেনার অভিপ্রায়ে বহু দূরদূরান্তর থেকে অসংখ্য লোক আসত।

উত্তর ভারতে মণ্ডপিকা নামে একধরনের বাজারের নাম পাওয়া যায়। ভারতের অন্যত্র মণ্ডপিকা বাজারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। সম্ভবত এগুলি হাটের চেয়ে বড়। তবে নগরের বাজারের থেকে এগুলি খুবই ছোট। মণ্ডপিকার অস্তিত্ব দাক্ষিণাত্যে দেখা যায় না। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'Markets and Merchants in Early Medieval India' নামক এক প্রবন্ধে রাজস্থানে মণ্ডপিকা ও হাটের কথা উল্লেখ করেছেন। হাট ও নগরের মধ্যবর্তী বাজার বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে মণ্ডপিকাগুলি অবস্থান করত। আবার মণ্ডপিকাগুলি কোথাও বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের কাজ করত। এখন প্রশ্ন তাহলে কি দাক্ষিণাত্যে নতুন একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় যা 'সছে' বা 'অড্ড'

তুলনায় বড় কিন্তু বৃহৎ নগরের বাজারের তুলনায় ছোট। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও রণবীর চক্রবর্তী 'পেষ্ঠা', 'পিষ্ঠা', 'পেংটা' বলে আর একধরনের বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন যে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের বহুস্থানের নামের শেষে 'পেঠ' শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন কাজিপেঠ, নারায়ণপেঠ ও বেগমপেঠ ইত্যাদি। অবশ্য প্রশাসনিক এলাকা হিসাবে 'পেঠ' শব্দটি ব্যবহৃত হত। প্রকৃতপক্ষে 'পেঠ' গ্রাম ও নগরের সংযোগসূত্র হিসাবে কাজ করত এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত ছিল। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত জৈন লেখক সোমদেব সুরির লেখা যশস্তিলকচম্পু নামক গ্রন্থে। সোমদেব শ্রীভূতি নামক এক ব্রাহ্মক্ষণের দ্বারা এক 'পেষ্ঠা' প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীভূতি যে পেষ্ঠাটি নির্মাণ করেছিলেন তা অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত ছিল এবং পেষ্ঠাটিতে মজুত রাখার জন্য বৃহৎ কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। নানা দেশ থেকে নিয়মিত আসতেন বণিকের দল। এখানে ভোজনালয়, আসনযুক্ত সভাগৃহ, বীথি বা রাস্তা ও দোকান সংযুক্ত হয়েছিল। পেষ্ঠাটি আয়তনে প্রায় দু'মাইল। সোমদেব সুরি পেষ্ঠাটিতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশে কাকতীয় বংশের রাজত্বকালে রাজধানী বরঙ্গলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখতে 'পেংটা' শব্দটি পাওয়া যায় যা পেষ্ঠারই সামান্য ভিন্নরূপ। পেংটাগুলি বাণিজ্য শুল্ক আদায় করত এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার মতো লেনদেন হত। এখানে স্বদেশী ও বিদেশী বণিকরা উপস্থিত থাকত।

তবে দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মণ্ডপিকার মতো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিকাশলাভকরেছিল নগরম। চোল লেখমালায় বহু নগরম-এর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে নগরম ছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গঠিত হত নাড়ু। নগরমগুলি গ্রামের সঙ্গে এবং নাড়ুর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজ করত। তবে সব নাড়ুতে সম্ভবত নগরম ছিল না। স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে চোল শাসিত দাক্ষিণাত্যে সক্রিয় ছিল নগরমগুলি।

বাংলায় স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে হট্ট বা হাটের অস্তিত্ব তাম্রসূত্রে খুঁজে পেলেও মণ্ডপিকা বা পেষ্ঠার অবস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ড. রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গের ৯৭১ খ্রিস্টাব্দের চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে সম্ভাণ্ডারিয়াক শব্দটির উল্লেখ আছে। সম্ভাণ্ডারিয়াক শব্দের অর্থ যেখানে পণ্যসামগ্রী মজুত করার ব্যবস্থা আছে। সম্ভাণ্ডারিয়াক বোধহয় মণ্ডপিকা বা পেষ্ঠার মতোই গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী মাঝারি আয়তনের এক জাতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। তবে নদীমাতৃক বাংলায় নদী বন্দরগুলি সম্ভবত গ্রাম ও নগরের বড় বাজারের সঙ্গে প্রধান যোগসূত্রের কাজ করত। এযুগে দেবপর্বত এমনই একটি প্রাণবন্ত অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর। দেবপর্বত বন্দরকে বাংলাদেশের ময়নামতীর সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। দেবপর্বত ক্ষীরোদা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ক্ষীরোদা নদীর উভয়তীরে বহু জলযানের ও নাবিকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাম্রশাসনগুলিতে দেবপর্বতের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবপর্বত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের নদীবন্দর হিসাবে কাজ করত। এসময়ের অনেক নদী বন্দরের নাম পাওয়া যায়। অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বাণিজ্যে এই নদী বন্দরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই নদীবন্দরগুলি আদিমধ্য যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ বেলাকুল বা বন্দর। ড. রণবীর চক্রবর্তী বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ও নদী পথগুলি বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তাঁর মতে নবম ও দশম শতক হতে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া লহড়চন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে ধৃতিপুরের 'হট্টক' উল্লেখিত হয়েছে। স্থানটির নামের শেষে 'পুর' শব্দটির প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে আবার 'হট্টক' বা 'হাট' শব্দটির সংযোগ নিঃসন্দেহে এর নাগরিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়।

তবে বাংলার এযুগের বাণিজ্য সম্পর্কে ড. তরফদার মনে করেন খ্রিস্টীয় সাত শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সময় মুদ্রার প্রচলন হ্রাস পেয়েছিল এবং সেন আমলে মুদ্রার প্রচলন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা এযুগের কোন মুদ্রাই পাওয়া যায়নি। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ কড়ির মাধ্যমে চলত। একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাবাকৎ-ই-নাসিরীতে। সেইজন্য মনে হয় এযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে সমুদ্র বাণিজ্যে ভাঁটা পড়েছিল। আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিতে যে সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বণিকদের তেমন স্থান নাই। এমনকি বল্লালসেনের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি সুবর্ণ বণিকদের পংক্তিচ্যুত করে নিম্নশ্রেণীর

জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এই তথ্যের যদি বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকে তাহলে বুঝতে হবে বণিকদের সঙ্গে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে বণিকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই কেউ কেউ বলেছেন পাল-সেন আমলে সমাজ পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে পড়েছিল। যদিও নিঃসন্দেহে তথ্যের অভাবে এই মত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মুসলিম অধিকারের পূর্ববর্তীকালে বাংলায় যে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ড. তরফদার যে মতই পোষণ করুন সম্ভবত একথাই যথার্থ যে পট্টিকেরা, দেবপর্বত ও চট্টগ্রামের রামুর নিকটবর্তী কোন বন্দরই ছিল বোধহয় গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলিম আগমন পর্যন্ত এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রাক্-মুসলিম যুগে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ একত্রভাবে ছিল একটি অর্থনৈতিক ইউনিট যার অংশগুলো নদীপথ ধরে পরস্পরের মধ্যে অনবরত যোগাযোগ করে চলত। ক্ষীরোদা নদী ময়নামতীকে পরিখার মতো ঘিরে রেখেছিল। কিছু সংখ্যক তাম্রলিপিতে উল্লিখিত 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' ও বণিক শ্রেণীর উল্লেখ আছে। শব্দগুলি নগর সভ্যতার দ্যোতক। উত্তর ভারতে এরকম বণিকদের সংগঠন পাওয়া না গেলেও দক্ষিণ ভারতে কোলাপুর, মিরাজ ও বেলগাঁওতে বণিকদের সমাবেশ ঘটত। রাজস্থান, গুজরাট ও কোঙ্কন থেকে বণিকরা এখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আসত এবং এখানে থেকে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করত। এইসব বণিকদের পরিচয় ও নামের তালিকা পাওয়া গেছে। এইসব বণিকরা পণ্যসম্ভার নিয়ে আসত এবং সেগুলি বিক্রী করে তারা স্বগৃহে ফিরে যেত। তবে লেখ থেকে জানা যায় যে শাসকরা এই সব বণিকদের নিরাপত্তার বিধান করতেন।

বাংলায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদীপথ বা নদীবন্দরগুলি যোগসূত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ভারতের অন্যান্য স্থানে জলপথের থেকে স্থলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। রাস্তাঘাট সুরক্ষিত ছিল। এসময় স্থলপথের বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এসময় গাধা বা উটের পিঠে করে পণ্যসম্ভার একস্থান হতে অন্য স্থানে বণিকরা নিয়ে যাতায়াত করত। তবে গরুর পিঠে মালবহনের রীতি। ভারতের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য। রাজস্থানে প্রাপ্ত লেখ থেকে ড. চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন গরুর পিঠে পণ্যসম্ভার বহন করে বাণিজ্যিক লেনদেন বহুদূর পর্যন্ত চলত। ইরফান হাবিব যে 'বানজারা'র কথা বলেছেন তা রাজস্থানে আদিমধ্য যুগেও প্রচলিত ছিল। এক একটি শস্য বহনকারী বৃষের দলে ব্যবসার কাজে শত সহস্র বৃষ বহাল রাখত। একসঙ্গে এই বৃষের দলটি পিঠে করে মাল বহন করে এক স্থান হতে বহুদূর স্থানেও নিয়ে যেত। পথে নিরাপত্তার জন্যই একসঙ্গে দল বেঁধে এই 'বানজারারা' গমনাগমন করত। তাদের সুবৃহৎ শস্যবহনকারী শকটের জন্য অনেক সময় ৪০,০০০ পর্যন্ত বলদের প্রয়োজন হত।

হিউয়েন সাঙ (৬৩০-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ), কিয়াতানের চীনা বিবরণ (৭৮৫-৮০৫ খ্রিস্টাব্দ), আলবেরুণী (জন্ম ৯৭০-৭১-মৃত্যু ১০৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং নবম শতকে সুলেমান রুহমীর এবং অল্-ইদ্রিস ও অল্-মাসুদী (৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) এযুগের বেশ কয়েকটি স্থলপথ ও জলপথের উল্লেখ করেছেন। স্থলপথগুলি দেশের বাণিজ্য সংযোগের ক্ষেত্রে শিরা-উপশিরার কাজ করত। পথ কর তখন আদায় করা হত। রাস্তাঘাট বণিকদের কাছে সুরক্ষিত ছিল। কারণ দক্ষিণ ভারতের লেখতে একটি বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যদের সশস্ত্র প্রহরা দিয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধানের কথা উল্লেখ আছে। উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র কনৌজের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগের কয়েকটি স্থলপথের কথা আলবেরুণী উল্লেখ করেছেন। তবে এই পথগুলি কীভাবে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত হত তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। স্থলপথে ও জলপথে যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সজীব ছিল তা এই তথ্য থেকে জানা যায়। যদিও রামশরণ শর্মা এযুগের বাণিজ্যে অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর "Commerce and Money In Western And Central Sectors of Eastern India" নামক প্রবন্ধে মধ্য ভারতের বহু বাণিজ্য কেন্দ্র ও বণিকদের কার্যকলাপের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য: আদিমধ্য যুগেও যে বৈদেশিক বাণিজ্য সজীব ছিল তার বহু তথ্য পাওয়া যায়। যদিও রামশরণ শর্মা এযুগের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা সামুদ্রিক বাণিজ্য অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যুগপৎ দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য চালান ভারতীয়দের বাস্তবিকই প্রধান ঐতিহ্য। শতপথ ব্রাহ্মণেও সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাসেও সমুদ্রবাণিজ্যে

ভারতের এক অভাবনীয় গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ভারত কোন কালেই বাণিজ্যকে অবহেলা করেনি। প্রকৃতপক্ষে রোম-ভারত বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে ইসলামের আবির্ভাব ও সমুদ্রে মুর ও আরব জাতির আধিপত্যের ফলে ভারতের সঙ্গে ইওরোপের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাতে কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যের বহর কমেনি বা পাশ্চাত্য দেশগুলির ভারতীয় পণ্য বন্টনের ব্যাপারেও কোন অসুবিধা ঘটেনি। আরবরা ভারতীয় পণ্য লোহিতসাগরে বয়ে নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে যেত দামাস্কাসে ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। তারপর এই দুই দেশ থেকে ভারতীয় পণ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও সেই অঞ্চল ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশের বাজারেও স্থান করে নিত। মূর বণিকদের মাধ্যমেও ভারতীয় পণ্য দূরদেশে পৌঁছে যেত। যেমন, আফ্রিকার উপকূল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। স্থলপথে এশিয়া, পারস্য ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মূলতান, কোয়েটা সড়ক, খাইবার গিরিপথ ও কাশ্মীরে যাওয়ার রাস্তাগুলিই ভারতের সঙ্গে ঐ দেশগুলির সংযোগ রক্ষা করত। সুদূর অতীত থেকে পায়ে পায়ে চলে এসব পথের সৃষ্টি আর এসব পথের সঙ্গে সারি সারি বণিক দলের নিবিড় পরিচয় ছিল। সারিবদ্ধ বণিকদল তাই ভারতের মধ্য দিয়ে পথ চলে চলে বসরা, ইরাক, এমনকি সুদূর দামাস্কাসেও চলে যেত। পারস্য উপসাগরবর্তী কোন কোন দেশ তাদের খাদ্যের যোগানের জন্য সম্পূর্ণভাবেই ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রধানত বাংলা ও গুজরাট বন্দরের মাধ্যমেই ভারতের রপ্তানি ব্যবসা চালিত হত।

ডডওয়েলের ভাষায় বলা যায় ইসলামের আবির্ভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপে এই তিন মহাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পরিচয় স্মরণাতীতকাল থেকে। বহু আরব বণিক ভারতীয় পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে আসাযাওয়া করত। তাদের বাণিজ্য তরীগুলি বিভিন্ন বন্দরগুলিতে ঘোরাফেরা করত, যদিও ছোটখাট বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। আরবরা এইসমস্ত বণিকদের কাছ থেকেই ভারত সম্পর্কে তথ্যাদি পায়। অল্-বিলাধূরির লেখা থেকে জানতে পারি খলিফা ওমর ৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে বম্বের নিকট থানের বিরুদ্ধে ভারতে এক অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু অভিযান ব্যর্থ হয়। সমুদ্রপথে বিপদের কথা স্মরণ করেই খলিফা ওমর সমুদ্র পথে অভিযান নিষিদ্ধ করে দেন। তাই প্রথমদিকে আরবীয়রা সমুদ্রপথে অভিযানে রত হয়নি। ইসলামের নতুন জীবন দর্শন আরবীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে আরবীয়রা এযুগে এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে এবং এর ফলে ভারত মহাসাগরে সমুদ্র বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এপ্রসঙ্গে ভারতের দুই উপকূলে অনেকগুলি বন্দর বা বেলাকূলের তালিকা ড. রণবীর চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের পথেই ভারত মহাসাগরে সমুদ্রবাণিজ্যে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের চোলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরে সমুদ্র বাণিজ্যে জাহাজি সওদাগরদের গুরুত্ব অপরিসীম। এঁরা সাধারণ মাঝি বা নাবিক নন। জাহাজের চালক বা ক্যাপ্টেনের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ধনী। আদিমধ্য যুগের ভারতীয় তাম্রশাসনে এই বিশেষ বণিক 'নৌবিত্তক' বলে অভিহিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ যাদের বিত্তের উৎস নৌ বা জলযান। তাদের সহজেই জাহাজি বণিক বলে চেনা যায়। সমকালীন আরব বিবরণ ও ইহুদি বণিকদের চিঠিপত্রে জাহাজি বণিকদের 'নাখুদা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপকূলের সমাজে নাখুদা ও নৌবিত্তক আদিমধ্য যুগে যথেষ্ট পরিচিত নাম। আদিমধ্য যুগে এই শব্দ দুটি এত ব্যবহৃত যে সংস্কৃত লেখতে কখনও কখনও নৌবিত্তক 'নৌ' ও 'নাখুদা' 'নাখু' এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত হয়ে গেছে।

সেযুগে সমুদ্রপথে যাত্রা ছিল খুবই বিঘ্নসঙ্কুল ও বিপদসঙ্কুল। কারণ এযুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত নৌব্যবস্থা ও বাষ্পীয় পোতের অস্তিত্ব ছিল না। জলপথে জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল ছিল না। এতসব বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উপকূল বাণিজ্যের প্রতি ভারতীয়দের অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল এবং আরব ও অন্যান্য দেশের বণিকরা এশিয়া বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করায় ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটা সফল বাণিজ্য যাত্রায় যে পরিমাণ লাভের কড়ি ঘরে আসত তাতে সমুদ্রপথের সবরকম বিপদ ও ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ হয়ে যেত। কোন কোন বিদেশী বণিক আবার বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবসায়ী সংগঠন চালু রাখার ব্যয়ভার বহন করতে পিছপা হত না। দেশের অভ্যন্তর প্রদেশেও মাল চলাচলের জন্য ব্যবস্থা ছিল। এইসব সুব্যবস্থা থাকার জন্য দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য চালু ছিল।

সমুদ্রবাণিজ্যে আরব বণিকদের ভূমিকা সুবিদিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইহুদি বণিকদের কথা। আদিমধ্য যুগে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রবহমানতা বা অবক্ষয় সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে বুঝতে হলে সমগ্র পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যে তথ্য প্রয়োজন তা আমাদের হাতে বর্তমান নেই। আমদানি-রপ্তানির খুঁটিনাটি তথ্য এবং নির্দিষ্ট মরশুমের বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান, হিসেব-নিকেশ ও উদ্বৃত্তের ভাগ-এসবের মধ্যকার কোন উপাদানই সেকালের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া অসম্ভব। প্রমাণের আভাস ইঙ্গিতের ওপর নির্ভর করে এই বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে করার চেষ্টা করা যেতে পারে। নয় শতকের সুলেমান রুহমী 'মিহি ও সূক্ষ্ম' সূতা বস্ত্র দেখেছিলেন। প্রাথমিক যুগের আরব ভৌগোলিকগণ উল্লেখ করেছেন 'সমন্দর' অর্থাৎ সম্ভবত এটি চট্টগ্রাম বন্দর-এই বন্দর ছিল একটি বিশাল শহর, বাণিজ্যনির্ভর ও সমৃদ্ধ এবং এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এই তথ্যগুলি সে যুগের বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে কিছুটা আলোকপাত করেছে। মার্কো পোলো জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ চীনের য়ুনান প্রদেশে যে কড়ির প্রচলন ছিল তা সেখানে ভারতীয় বণিক কর্তৃক আনীত হয়েছিল। আরাকান ও পেগুসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সূতিবস্ত্র তৈরি হত না বলে তারা উক্ত পণ্যের জন্য বাংলা তথা ভারতীয় বণিকদের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

একথা মনে করা হয় যে, মালাবার উপকূলে অবস্থিত কুইলন নামক বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে আরব বণিকরা চীনের দিকে রওনা দিত এবং বাংলার উপকূলভাগ স্পর্শ না করেই মালবের অন্তর্গত কালাহ বন্দরে সরাসরি গিয়ে হাজির হত। ভারতের উপকূল সম্বন্ধে আরবী বিবরণগুলি যদিও পৌরাণিক ভূগোলের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তবুও ইবন খুরদাদ বিহ 'পাক্ প্রণালীর ভেতর দিয়ে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরাঞ্চল ধরে একটি তীরকেন্দ্রিক সমুদ্রযাত্রা...' সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। নয় শতক হতে বার শতকের মধ্যে জীবিত সুলেমান, রুহমী বা রহমী ইবন খুরদাদ বিহ্ ও অল্-ইদ্রিসের চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের দেওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্য এবং ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া আব্বাসীয় 'দিনার' ও 'দিরহাম' থেকে প্রায় নিশ্চিতাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার নগর কেন্দ্রগুলিতে আরব বণিকদের আগমন ঘটত এবং তারাই আবার এই অঞ্চলের পণ্যগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিয়ে যেত। সাত থেকে দশ শতকের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের যে সকল স্থানে আরব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, তারমধ্যে পালেংবাম, লাম্বী (পরে পেদির নামে পরিচিত) এবং কালাহ পেগু বন্দর স্পর্শকারী সমুদ্রবাণিজ্যের একটি রেখাপথ দ্বারা বোধহয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ এই বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলা যুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ আরাকান-বার্মা, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র সক্রিয় ছিল।

প্রাক্-মুসলিম যুগে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ একত্রভাবে একটি অর্থনীতিক ইউনিট যার অংশগুলো নদীপথ ধরে পরস্পরের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। যে ক্ষীরোদা নদী ময়নামতীকে পরিখার আকারে ঘিরে রেখেছিল, তারই দুপাশে অবস্থিত অঞ্চলের পশ্চাদভূমির সঙ্গে এই নগরকেন্দ্রগুলি যোগাযোগ রেখেছিল। এই নদী সম্ভবত গোমতীর শাখা ছিল এবং মেঘনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডাকাতিয়ায় গিয়ে পড়ত। অতএব এই প্রাকৃতিক নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। চট্টগ্রাম এবং রামু অথবা আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় দিয়াং যার প্রাচীনত্ব, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপকরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে দিয়াং বাংলার সমুদ্র বন্দর হিসাবে কাজ করেছিল। বর্তমানে যে ধলেশ্বরী নদী মেঘনায় গিয়ে পড়েছে তার তীরে অবস্থিত বিক্রমপুর শহরটির বোধহয় কিছু বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল।

তাম্রলিপি ও মুদ্রায় সমতট মণ্ডলে পাট্রিকেরা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক জীবনে এই শহরটির গুরুত্ব নির্দেশ করে। কারণ শহরটি ক্ষীরোদা ও গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। লহড়চন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে ধৃতিপুরের 'হট্টক' উল্লিখিত হয়েছে। 'হট্টক' বা হাট শব্দটির সংযোগ নিঃসন্দেহে নাগরিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়। সেযুগের তাম্রলিপিগুলিতে চট্টগ্রাম ও রামুর উল্লেখ নেই। তবে আরব লেখকদের বিবরণ থেকে শহর দুটির অস্তিত্ব আন্দাজ করা যায়।

নবম দশক শতক হতে বাংলার সমুদ্র বাণিজ্যে আরব বণিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আরব বিবরণীতে বঙ্গোপসাগর বহর হরকল নামে পরিচিত। বহর-এর অর্থ সমুদ্র, হরকল হল বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হরিকেল। এসময় আরব বণিকদের উপস্থিতিতে বাংলা সামুদ্রিক বাণিজ্যে গুরুত্ব অর্জন করে। অবশ্য এর আগেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ঘটেছিল রোম-বাণিজ্যের অবক্ষয়ে। তাছাড়া বন্যার পলিমাটিতে আবদ্ধ নদীপথের গতির পরিবর্তন বন্দর শহরের বিলুপ্তির ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ সরস্বতী নদী দুর্বল হওয়ায় তাম্রলিপ্ত বন্দর অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। আবার ধলেশ্বরী-মেঘনার তীরে অবস্থিত বিক্রমপুরের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আরও প্রযোজ্য। কারণ এই নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তন হয়। করমণ্ডল ও জাভার ক্রমাগত বাণিজ্যিক বৃদ্ধিই বোধহয় বহিরাগত শক্তি হিসাবে বাংলার বাণিজ্য পরিস্থিতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তবে বাংলা ও শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। ১০২১-২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাদের উপর রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণ এই সম্পর্ককে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

এশিয়ার বাণিজ্য ও নৌচালনার ক্ষেত্রে আরব বণিকগণ যে ভূমিকা পালন করে আসছিল সেকথা স্মরণে রাখলে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। যদিও বার্থেমার বিবরণকে অনেকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু আরব, পারস্য ও ইওরোপে বাংলায় প্রস্তুত বস্ত্রের চাহিদা ছিল তা বহু তথ্যে পাওয়া যায়। ইবন বতুতা ও মা-হুয়ান তাঁদের বর্ণনায় বাংলার বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের কাপড়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এই বিচিত্র ও বিপুল বস্ত্রসম্ভার যে যথেষ্ট পরিমাণে আরব, পারস্য, ইওরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিক্রী হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলা ইওরোপের চাহিদা মেটাত এবং এই মশলার বাণিজ্যে যোগ দিয়ে আরব ও ভারতীয় বণিকগণ বাংলা, দক্ষিণ-ভারত ও সুরাটের বস্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্রী করে লাভবান হত। বারবোসা ও বার্থেমার বিবরণে দেখা যায় এদেশের পণ্য সরাসরি রপ্তানি হত মালাক্কায় ও সুমাত্রায়। পশ্চিমদিকে সিংহল, মালাবার দ্বীপপুঞ্জ, মালদ্বীপ, চোল, দাবোল, ক্যাম্বে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং আরব উপকূল বাংলার সঙ্গে আরব বণিকগণ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

এযুগে বাংলা তথা ভারতের উপকূল ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবে ডাচ ঐতিহাসিক Bernard Schrieke মনে করেন মোঙ্গল আক্রমণ ও ক্রুশেডের পরবর্তীকালে এশিয়া ও ইওরোপের বাণিজ্যপথের গতি পরিবর্তন করায় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কুশ, এডেন ও ক্যাম্বে হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে প্রলম্বিত পথ বেয়ে এশিয়ার পণ্য পশ্চিমে চলে যেতে থাকে এবং পশ্চিম এশিয়া ও ইওরোপের দ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসতে থাকে। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্যাম্বে ও মালাক্কার মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গড়ে ওঠে। এই বন্দর দুটি ছিল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইওরোপ, আরব, পারস্য ও ভারতের পণ্য যেমন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যেত, তেমনি আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের দ্রব্য মালাক্কাকে কেন্দ্র করে ভারত, সিংহল, আরব ও ইওরোপে পৌঁছাত। Schrieke-এর এই মতকে ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন।

এশিয়ার বাণিজ্য ও নৌ-চালনার ক্ষেত্রে আরব বণিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে বোধহয় চীনে মোঙ্গল আধিপত্য স্থাপনের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। যদিও মনে করা হয় যে মোঙ্গল কর্তৃত্ব মৌলিক শক্তিসম্পন্ন একটি বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্যের এলাকা সৃষ্টি করেছিল। তবুও আরব বণিকদের সবার চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল। খোরদাদরাহ্, সুলাইমান, চুয়ু (১১১১ খ্রিস্টাব্দ), চৌ-কু-ফি (১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং চৌ-জু-কুয়ার (১২৪৫-৫০ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে জানা যায় যে আরবগণসহ বিভিন্ন জাতীয়তার মুসলিম বণিক চীন, জাভা এবং সুমাত্রায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। তেরো শতকের শেষভাগে ও চোদ্দ শতকের প্রথমে করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে চীনা বাণিজ্য অগ্রগতির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। চীন, জাভা ও সুমাত্রার মুসলিম উপনিবেশগুলিও এই সময়ে চীনা বণিকদের প্রাধান্যের ফলে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অথচ মার্কো পোলো (১২৫৭-৯১) চীনের মুসলিম উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কেন কিছু লিখলেন না তা বোঝা যাচ্ছে না অথচ চীনের এই মুসলিম উপনিবেশগুলি নয় শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আর বাগদাদের পতনের পর আরব বণিকগণ নিজেদের বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। সিরাফ থেকে বসরা ও

বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত নদীপথের সঙ্গে সংযুক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির মার্কো পোলো এক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের উক্ত বাণিজ্যপথটি একদিকে যেমন তার গুরুত্ব হারাচ্ছিল, তেমনি অপরদিকে আলেকজান্দ্রিয়া-এডেন-ক্যাম্বে লাইনের দিকে প্রলম্বিত পথটি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রাধান্য পাচ্ছিল। সেই অঞ্চলে মালাবারে অবস্থিত কুইলনে এবং অন্যান্য যেসব বন্দরে পণ্য বিনিময়ের জন্য চীনা বণিকদের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল সেসব স্থানেও আরবগণ তখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যদিও তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কিন্তু বাংলার নগর বন্দরগুলিতে তাদের আগমন আর নিয়মিত ঘটত না। এরপর যখন পূর্বদিকে মালাক্কা এবং পশ্চিমদিকে কালিকট ও ক্যাম্বে পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেল এবং গুজরাতী, করমণ্ডলীয় এবং বাঙ্গালা বণিক শ্রেণীর ভূমিকা যখন বৈদেশিক বাণিজ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিল, তখনই বাণিজ্যক্ষেত্রে এক নতুন পুনরুজ্জীবনের সূচনা হয়।

এযুগে দাক্ষিণাত্যও সমুদ্র বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল না। যদিও পল্লবরা সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেনি বা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তবে দশম শতাব্দীতে চোলেরা ক্ষমতা দখল করলে তারা সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বঙ্গোপসাগরে তাদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে সূচনা করে। এইদিক বিবেচনা করেই অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে চোলরা বঙ্গোপসাগরকে একটি 'চোল হ্রদে' পরিণত করেছিল। এই বক্তব্যে কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু তাদের কৌশলটা ছিল অন্ততপক্ষে মালাক্কা থেকে আরম্ভ করে মালদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রপথটি নিজেদের দখলে রাখা। এই অনুমান আরও স্পষ্ট হবে সিংহলের দিকে তাকালে। সিংহলে যতবার চোল আক্রমণ হয়েছে, তার কোনটাই পুরো সিংহল দখল করা নয়। বরং সিংহলের উত্তর অংশ দখল করে রাখা। কারণ সিংহলের বন্দরগুলি উত্তর অংশেই অবস্থিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলগুলি দখল করে বাণিজ্য পথটির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল। এই প্রচেষ্টাকে কখনও 'লুণ্ঠন নীতির প্রকাশ' বলে অভিহিত করা যায় না। তাছাড়া রাজেন্দ্রচোলের 'গঙ্গোদকোর' দ্বারা নিজ রাজ্য পবিত্র করার প্রচেষ্টা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তৎকালীন বঙ্গোপসাগরকে আরব বিবরণে বলা হয়েছে 'হরকন্দ' বা 'হরকল', যা হরিকেলের আরব অপভ্রংশ। হয়তো সেসময় হরিকেলের সামুদ্রিক বাণিজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি চোলদের গঙ্গা অভিযানকে সম্ভবত উৎসাহিত করেছিল।

চোলরাজগণ অর্থনৈতিক এই সামুদ্রিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে নিজেদের জড়িয়েছিল। প্রথম রাজরাজের বৃহৎ লেইদেন লেখ (১০০৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় নাগপত্তনম, শ্রীবিজয়ের রাজা বিজয়োতুঙ্গ বর্মণকে চূড়ামণি (বৌদ্ধ) বিহার নির্মাণে অনুমতি এবং বিহারের ভরণপোষণের জন্য আনাইমঙ্গলম গ্রাম থেকে প্রাপ্য সমস্ত রাজস্ব উক্ত বিহারকে দান করেছিল। যখন নাকি চোলরা সিংহলে একের পর এক বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করছে। শ্রীবিজয়ে চোলদের সংঘর্ষের কথা মনে করলে এই ধারণাই হয় যে চোলদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রীবিজয়ের নৌশক্তি ধ্বংস করা। সেই উদ্দেশ্য চোলদের পুরোপুরি সফল হয়েছিল একথা বলা যায়। শ্রীবিজয়ের জলদস্যুরা মালাক্কা প্রণালী প্রয়োজন মতো অবরোধ করে শ্রীবিজয় শুল্ক আদায় করত। বাণিজ্যের স্বার্থে শ্রীবিজয়ের এই ধরনের কার্যপ্রণালী বন্ধ করাও সম্ভবত চোলদের উদ্দেশ্য ছিল।

'চুল্লবংশ' থেকে জানা যায় যে তৎকালীন সিংহলের রাজা মহিন্দরের অপদার্থতা সম্পর্কে রাজরাজকে জ্ঞাত করেছিল সিংহলের এক অশ্ব বিক্রেতা। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় রাজা ও বণিকদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। চোল রাজাদের বাণিজ্যের প্রসারে উদ্যোগ প্রশংসা অর্জন করেছে। চোলরাজ তাঁর বন্দরে শুল্ক রদ করেছিলেন। এই ধরনের পদক্ষেপে রাজা এবং বণিকের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। সিংহলের বাতাভিয়াতে একটি তামিল গ্রন্থলেখ থেকে জানা যায় সিংহলে এই প্রথমবার নানাদেশের বণিকদের উপস্থিতি। আরও জানা যায় তারা চোল সৈন্যদের অনুসরণ করে সিংহলে এসেছে। সিংহলের বাজার দখল নেওয়ার এই প্রচেষ্টাতে বণিক ও রাজা একই স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অনেকে মনে করেন এ অঞ্চলে আরব বণিকদের আধিপত্য বিনষ্ট করাও ছিল চোলদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রথম কুলোতুঙ্গের একটি লেখ থেকে জানা যায় বিশাখাপত্তনমের সংস্কার করে তার নতুন নামকরণ হয় কুলোতুঙ্গ-চোলপত্তনম। চোঙ্গমণ্ডলমের একটি বন্দরের প্রতি চোল রাজদের আকর্ষণের কারণ সেইসময় বার্মা-আরাকান অঞ্চলে পাগাম রাজ্যের উত্থান। চোল-পাগাম বাণিজ্যকে সক্রিয় করার জন্য চোলরাজের এই প্রচেষ্টা এযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রকূটদের শাসনকালেও আরব বণিকরা

ভারতীয় উপকূল অঞ্চলের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। অল্-মাসুদী ও অল্-ইদ্রিসের বর্ণনায় ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য-ধারার বহু বন্দরের নাম ও বাণিজ্য-পথের পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে এযুগে বাণিজ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ সম্ভবত সেযুগে খুবই কম ছিল। এমনকি নৌগুলি কত টন পর্যন্ত মাল বহন করতে পারত সে সম্বন্ধেও পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় সবই ভাসা ভাসা সাধারণ বিবরণ মাত্র। তবে এটা আমরা জানতে পারি যে পারস্য উপসাগর, লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যের বাজার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু ঐসব দেশের চাহিদার প্রকৃতি কেমন ছিল তা জানা যায় না। সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশ অবশ্য খুব বেশি ছিল না। 'ভারতীয় উপকূলবর্তী স্থানে চালু ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌসম্পদের মালিক ছিল প্রধানত বিদেশীরা, আবার বিদেশীদের মধ্যে প্রধান ছিল আরবরা। গুজরাটের বেনিয়া, দক্ষিণের চেট্টি, ভারতে বসবাসকারী কিছু মূর বণিকদের নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র বণিক সম্প্রদায় বহির্বাণিজ্যের অংশীদার ছিল। মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বাইরের ভারতীয়রা তাই লাভজনক ব্যবসায় এগিয়ে আসত। কিন্তু মোটের উপর অধিকাংশ ভারতীয়ই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে বা সামুদ্রিক বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করত না কখনোই। ভারতীয়দের রীতিনীতি ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই এরকম কোন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিপন্থী ছিল।

তবে ভারত মহাসাগরে এই বৈদেশিক দূরপাল্লার বাণিজ্য ভারতীয়দের বিদেশী বণিকদের কাছাকাছি এনে দেয়। এই বাণিজ্যে ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ইহুদি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সে যুগেও ধর্মনিরপেক্ষতার এক বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এপ্রসঙ্গে ড. রণবীর চক্রবর্তী একটি তথ্য দিয়েছেন যা এপ্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন পারস্য উপসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর হরমুজের বণিক নূরুদ্দীন ফিরুজ ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে সোমনাথে এসেছিলেন। তিনি সোমনাথে একটি মসজিদ বা মিজিগিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে হিন্দু শ্রমিক গোষ্ঠীর কাছ হতে তিনি সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলেন এবং এই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন গুজরাটের চালুক্য বংশীয় রাজা বাঘেলারাজ অর্জনদেব। সেযুগে সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা থাকলেও একটা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সহনশীলতার ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছিল। আবার এই সামুদ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্য রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রকে এক অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল।

আদি মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব: ভূমি ও কৃষকের অবস্থা

(The emergence of feudalism in the early Middle India : Land and the status of peasantry.)

অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ভূমি বা কৃষকের অবস্থান বদলে গিয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আধুনিক কালে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোয় সামন্ততন্ত্রের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্তমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোসাম্বি ও শর্মা দুজনই এবিষয় একমত যে গুপ্তযুগের শেষদিকে বাণিজ্য ও নগরের অবনতির ফলে ভারতীয় গ্রাম প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে 'অগ্রহার' ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তা ৩০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটলেও তার ব্যাপ্তি ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অটুট ছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমি হস্তান্তরিত করার ফলে যে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাকে তাঁরা 'সামন্ততন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের রাজারা জমি হস্তান্তরিত করার ফলে তাঁদের সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং কৃষি অর্থনীতি বিঘ্নিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কৃষি অর্থনীতির ক্ষতি না হয়ে, বরং পতিত জমি চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হয়ে কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছিল। তবে কোসাম্বি এই পর্বের সামন্ততন্ত্রকে 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' বলেছেন। গুপ্তযুগে ও হর্ষের সময়কালে এই সামন্ততন্ত্র আরও প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রামে একশ্রেণীর জমিদারের আবির্ভাব ঘটে যারা স্থানীয় জনসাধারণের উপর পশুশক্তি প্রয়োগ করে। কোসাম্বি এই পদ্ধতিকে 'নীচু থেকে সামন্ততন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই তত্ত্ব ঐতিহাসিক মহলে সর্বজনস্বীকৃত নয়।

ড. রামশরণ শর্মা তাঁর Indian Feudalism নামক গ্রন্থে ডি. ডি. কোসাম্বির উক্ত দ্বিস্তর সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিরোধিতা করে বলেছেন ব্রাহ্মণ, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারকে ভূমিদান বা অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে গুপ্তযুগে এই জমিদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শর্মার বিচারে তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর জমিদানের মাধ্যমে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল। অগ্রহার দানের ব্যবস্থা প্রথমে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত হলেও পরে তা অন্যান্যদের মধ্যেও ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়। লৌকিক উদ্দেশ্যে রাজস্ব দানের নীতি চালু হলে সামন্তপ্রথার ভিত্তিকে মজবুত করে। ড. শর্মার মতে গুপ্তযুগে ভূমিদান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. শর্মা ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কাল ৩০০ খ্রিস্টাব্দকে ধরে নিয়ে এই ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশের চূড়ান্ত রূপটি ধরা পড়ে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁর মতে আদিমধ্য যুগের শেষ পর্বটি হল সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশশীল ও চূড়ান্ত ভাঙনের কাল।

গুপ্তত্তোর যুগের দানপত্রগুলি থেকে দেখা যায় যে সামন্ততন্ত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে গোষ্ঠী অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। চারণক্ষেত্র, বনভূমি, জলাধার ইত্যাদিও দানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং, অর্থনৈতিক দিক থেকে ইওরোপের মতো ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল কথা হল মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব। এর ফলে কৃষকের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছিল। তাদের বেগার শ্রমের (বিষ্টি) বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর মতে ভারতের কৃষক প্রায় দাসে পরিণত হয়েছিল। এইরকম অর্থনীতিতে মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তাঁর মতে দানগ্রহীতারা কার্যত জমিদারে পরিণত হয়েছিল। দানকরা জমিতে যে কৃষকরা ছিল তাদের আনুগত্য দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের দিতে বলা হয়। রাজার সাতটি অধিকারের মধ্যে কর আদায় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা প্রধান। এদুটি অধিকার গুপ্তযুগের ভূমিপট্টগুলিতে দেখা যায় ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং 'অগ্রহার' ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত শাসনের অধিকার, যা হল সামন্তপ্রথার অন্যতম প্রধান লক্ষণ তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। গুপ্তযুগে 'অগ্রহার' ব্যবস্থার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাম্রশাসনগুলি বিচার করলে দেখা যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নালন্দা মহাবিহারকে যে ২১৪টি গ্রাম তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করা হয়েছিল সে তথ্যও পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দেবপালের একটি তাম্রশাসন হতেও নালন্দা মহাবিহারকে ৫টি গ্রাম দান করার তথ্য পাওয়া যায়। স্বভাবতই বলা যায় যে প্রতিষ্ঠান ২১৪টি

গ্রামের রাজস্ব ভোগ করার অধিকার অর্জন করেছিল সে প্রতিষ্ঠান একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল বলে ড. শর্মা মনে করেন। পালদের তাম্রশাসনে বহু ব্রাহ্মণকে অগ্রহার ভূসম্পদ দান করা হয়েছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদের ভূমি ও গ্রামদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আবার সেন বংশের শাসনকালে আরও বৃদ্ধি পায়। প্রতিহার শাসকদের শাসনকালে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছিল সে দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজাদের শাসনকালেও অগ্রহার ব্যবস্থা যে প্রচলিত ছিল তা তাদের তাম্রশাসনে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন মন্দিরকে ভূমিদানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এরফলে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি প্রায় ভূস্বামীতে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়।

অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত ভূস্বামীর ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ভূস্বামীর সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জমিতে কৃষকের অবস্থান বদলে যায়। ভূমিব্যবস্থায় তিন ধরনের মালিকানা দেখা যায়-মহীপতি (রাজা), স্বামী (জমির মালিক) ও কর্ষক (জমির চাষী)। স্বামী বা জমির মালিকের জমির পরিমাণ বেশি হলে তার পক্ষে সব জমি চাষ করা সম্ভব হত না। ফলে চাষ করার জন্য কৃষক নিয়োগ করা হয় এবং এই কৃষক জমির মালিকের প্রধান হয়। জমির মালিক ছাড়াও 'ভোগদানকারী' বলে একটা শ্রেণী ছিল। ভোগদানকারী আবার কৃষকের থেকে পৃথক ছিল। প্রকৃতপক্ষে জমিতে কৃষকের এই সময় মালিকানাও ছিল না ও ভোগদখলের অধিকারও ছিল না। নালন্দা মহাবিহার ও দক্ষিণ ভারতে মন্দিরগুলি যেভাবে বহু জমির মালিক হল তাতে তাদের পক্ষে জমি চাষ করা সম্ভব হল না। তখন চাষী নিয়োগ করা হয়। এই চাষীদের মালিকানা বা ভোগ দখলের অধিকার খুব বেশি ছিল না। বিভিন্ন তাম্রশাসনে দেখা যায় দানগ্রহীতাকে বলা হয়েছে যে সে নিজে চাষ করবে বা কাউকে দিয়ে চাষ করিয়ে নেবে। এই ব্যবস্থায় চাষী ও জমির মালিকের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারের ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এছাড়া একধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ব্যবস্থায় জমির মালিকের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও ভূমিব্যবস্থায় নানাস্তরের প্রকাশের মধ্যে ড. শর্মা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন।

গুপ্তযুগের পর বেতনের পরিবর্তে জাগীর প্রথা খুবই বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার পরিমাণ যত হ্রাস পেতে থাকে ততই জমি বেতনের পরিবর্তে দেওয়ার প্রথা বৃদ্ধি পায়। এই সকল জমিগ্রহীতার নাম ছিল ভোগপটীকা বা ভোগিকা। এর অর্থ এরা জমি ভোগ করত। ড. শর্মা বলেছেন তিনপুরুষ একাদিক্রমে জমি ভোগ করছে এরকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ভোগপটীকা গ্রামের কৃষকদের ওপর অত্যাচার করত সে দৃষ্টান্তও আছে। সপ্তম শতাব্দীতে মহাভোগী নামে একশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা ছিল বড় সামন্ত। ক্রমে জমি বংশানুক্রমিক বন্দোবস্তের অধীন হয়ে যায়। শাসন ও বিচারের অধিকারও বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হয়। ড. শর্মা এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে জমি দখল করে সেই জমি ভোগের ও শাসনের অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থা আদিমধ্য যুগ পর্যন্ত দেখা যায়।

শর্মা মনে করেন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট যুগে সামন্তপ্রথার দ্রুত প্রসার ঘটে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা, কেন্দ্রীয় শক্তির পতন ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। বণিকদের চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হলে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কৃষির ওপর চাপ পড়ে। শক্তিশালী লোকেরা সামন্তশ্রেণীতে নিজেদের স্থান করে নেয়। রামশরণ শর্মা তাঁর Urban Decay in India. 300-1000 A.D. গ্রন্থে নগর জীবনের

অবক্ষয়ের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে নগরজীবনের এই অবক্ষয়ের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ স্পষ্ট। যদিও এটিকে অন্যান্য প্রখ্যাত গবেষকগণ সমর্থন করতে পারেননি। তবে এই সময় সামন্তশর্তে বহু জমি বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব মন্দির ও সন্তদের দান করা হয়। প্রতিহার রাজারা ব্রাহ্মণদের যেসকল জমি 'অগ্রহার' দান করেন সেগুলিতে সামন্তস্বত্বের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রকূট রাজারাও মন্দির ও ব্রাহ্মণদের বহু গ্রাম দান করেন তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এমনকি, রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার রাজারা তাঁদের কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে গ্রাম দান করতেন। এই কর্মচারীরা তাদের দানপ্রাপ্ত এই জমি তারা পুনরায় বন্দোবস্ত দিত। পাল রাজাদের একটি ভূমিপট্টলা থেকে জানা যায় যে জনৈক কর্মচারী তার

দানপ্রাপ্ত জমি পুনরায় বন্দোবস্ত দেয় (১০৫৫-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ)। প্রতিহার ভূমিপট্টতে দেখা যায় যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে উচ্ছেদ করার অধিকার মধ্যস্বত্বভোগী অর্জন করত। মধ্যস্বত্বভোগ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামন্তপ্রথা বেশি অর্থের লোভে মধ্যস্বত্ব বা অধি-সামন্ত পাল্টাতেন এবং নতুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা লাভজনক শর্তে পুরাতন কৃষকদের উচ্ছেদ করে নতুনভাবে কৃষকদের বন্দোবস্ত দিত। কৃষকদের জমির ওপর নিরাপদ কোন স্বত্ব থাকত না। ক্রমে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে বিভিন্ন স্তরে। সামন্তপ্রভু যখন অর্থের লোভে মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি হস্তান্তর করতেন তখন কৃষক-চাষী কোনো আপত্তি। করতে পারত না। জমিতে ভাদের কোন স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অবস্থা ছিল করুণ। ভূমিদাসের মতোই তাদের বেগার খাটতে হত। পাল লিপি থেকেও জানা যায় কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটতে হত। প্রতিহাররাও বেগার খাটাত। বেগার খাটিয়ে চাষ করার প্রথা ব্যাপক ছিল। কৃষক রমণীদেরও বিভিন্ন কাজে বেগার খাটতে হত সে তথ্য পাওয়া যায় বাৎসায়নের কামসূত্রে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা ভূস্বামীর উত্থানের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। সামন্তরা যে ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন প্রমাণ হিসাবে অনেকে দেখিয়েছেন যে রামপাল তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামন্তদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ড. শর্মার মতে সামন্তব্যবস্থা একান্তই কৃষি অর্থনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল।

কৃষি যে এযুগে সবিশেষ সম্প্রসারিত হয়েছিল তা বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যায়। সকলে কৃষিকে জীবিকার ভাল পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সোমদেব কৃষিকর্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। কৃষির প্রতি এই গুরুত্বদানকে ড. শর্মা শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা বলে মনে করেন। তাঁর মতে এই সময়কালে (৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ) বাণিজ্যের প্রাধান্য তেমন কোন তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ভূমিদানের মাধ্যমে যে গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে তা স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি। তখন গ্রামে যা উৎপাদন হত তা গ্রামের মানুষই ভোগ করত। পণ্য বাইরে পাঠানোর মতো উৎপাদন হত না। তাই এইরকম অর্থনীতিতে বাণিজ্যের অবক্ষয় সূচিত হয়। আবার বাণিজ্যের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী ছিল মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা। মুদ্রার প্রচলন এযুগে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। রাষ্ট্রকূট-পাল-সেন রাজাদের মুদ্রা পাওয়া যায় না। এই সময় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি বিলুপ্ত হয় বলে মনে করেন ড. শর্মা। মুদ্রার পরিবর্তে বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে 'কড়ি'র মাধ্যমে। শর্মার মতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নগরায়ণের অবক্ষয়।

নগরের অবক্ষয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবলুপ্তিকে সামন্তব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণ বলে শর্মা মনে করেন। তাঁর মতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে নগরের যে ভূমিকা ছিল তা মধ্যযুগে অস্তমিত হয়।

ড. শর্মার আদিমধ্য যুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনায় দেখা যায় ভূমিদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক নানাস্তরে সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এর ফলে কৃষকের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কৃষক 'আশ্রিতহালিক'-এ পরিণত হয়। তবে ইওরোপের কৃষকের মতো ভারতীয় কৃষক আদিমধ্য যুগে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল কি না ড. শর্মা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে কৃষক যে করের অত্যাচারে পালিয়ে যেত সে তথ্য পাওয়া যায়। এযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যের অবক্ষয় এবং তার ফলে নগরায়ণের অবলুপ্তি। অর্থাৎ নগরের অস্তিত্ব টিকে রইল বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে নয়, প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে। আবার ড. শর্মা ও যাদব ১০০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সময়কালে সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশ ও ভাঙন লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে আদিমধ্য যুগে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেই নগরগুলি প্রায় গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল বলে যাদব মনে করেন।

তবে ড. শর্মা ও যাদবের আদিমধ্য যুগে এই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারেননি প্রবাদপ্রতিম গবেষক দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চম্পকলক্ষ্মী ও রণবীর চক্রবর্তী। দীনেশচন্দ্র সরকার শর্মা ও যাদবের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন গুপ্তযুগের পরে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়নি এবং মুদ্রার পরিমাণও বিশেষ হ্রাস পায়নি।

মুদ্রা যেটুকু হ্রাস পেয়েছিল 'কড়ি' তার ক্ষতিপূরণ করেছিল। তাই ড. সরকারের মতে যাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলা হচ্ছে তা আসলে ভারতের চিরাচরিত 'জমিদারি' প্রথা ছাড়া কিছু নয়। ড. সরকার আদিমধ্য যুগের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের থেকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে 'ভূমিদান' ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা করভোগের অধিকার নিশ্চয়ই পেতেন কিন্তু তার জন্য রাজার রাজকোষে চাপ পড়ত কিনা তা একান্তই সন্দেহ। তাঁর মতে কর সংগ্রহের অধিকার ও ক্ষমতা দানগ্রহীতার ছিল না। অবশ্য ড. সরকার আদিমধ্য যুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কথা স্বীকার না করলেও, তিনি এযুগের অর্থনৈতিক আলোচনায় Feauditory, feaf প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এই জাতীয় শব্দ সামন্ততন্ত্রের আলোচনাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রথাকে আধিপত্য অর্থাৎ অনেক প্রভুর উপরে একের প্রভুত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। হরবনস্ মুখিয়া মনে করেন আদিমধ্য যুগের কৃষকেরা যে ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মতো ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল সে তথ্য পাওয়া যায় না। গবেষক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, চম্পকলক্ষ্মী ও রণবীর চক্রবর্তী তাঁরা মধ্যযুগের এক সৃজনশীল কৃষি অর্থনীতির চিত্রই তুলে ধরেছেন। তাঁরা উন্নত কৃষি সম্প্রসারণে সেচের ভূমিকা ও লৌহ শিল্পের বিকাশের চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আবার তাঁদের গবেষণায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল চিত্রই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এইসব গবেষকগণের গবেষণায় এযুগের শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিবর্তে এক সজীব অর্থনৈতিক চিত্রই পাওয়া যায়। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় সে যুগের নগরায়ণের অবক্ষয়ের পরিবর্তে এক সচল নগরায়ণের কথাই আমাদের জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্র এবং ভারতের তথাকথিত সামন্ততন্ত্র যাকে বলা হচ্ছে তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ম্যানর প্রথা ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই প্রথা ভারতে কোনদিনই ছিল না। গুপ্তযুগের পরে যে গ্রাম বা ভূমিদান করা হয়েছিল তাকে কোনমতেই 'ম্যানর'-এর সমতুল বলা যায় না। ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস কিন্তু আদিমধ্য যুগের উৎপাদন এবং করব্যবস্থার ভিত্তি ছিল কৃষক পরিবার। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে প্রায় একই সময়ে ভারত ও ইওরোপের উৎপাদন পদ্ধতি এক ছিল না।

তবে ভারতের কৃষককে যে একদা ক্রমবর্ধমান করভার বহন করতে হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক ভূমিদান গ্রহণকারীর জন্য বহুসংখ্যক পরিহারের কথা উল্লেখ আছে। বাকাটকদের একটি দানপত্রে চোদ্দটি পরিহারের কথা উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে উদ্রঙ্গ, উপরিকর ইত্যাদি নতুন কর ধার্য করা হয়েছিল। ৬০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে এই সময়কালে কৃষকদের উপর করের পরিমাণ যে ক্রমশ বেড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবন্ধ চিন্তামণি, রসমালা ও প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে। প্রথম রাজরাজ চোলের রাজত্বের অষ্টম বছরে একটি লেখতে একখণ্ড 'দেবদান' জমি সম্পর্কে পঞ্চাশটি পরিহারের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই সামন্ততান্ত্রিক খাজনার ক্রমিক বৃদ্ধি কৃষি সম্প্রসারণ এবং উন্নত কৃষি উৎপাদনের জন্য হয়েছিল কিনা তা বলা যায় না। তবে এই খাজনার সঙ্গে যে কৃষকের জমি থেকে উচ্ছেদের সম্পর্ক ছিল সম্ভবত তা বলা যায়। প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় যে কোন কোন অঞ্চলে, যেমন মালবে, গুজরাটে, রাজস্থানে এবং মহারাষ্ট্রে কৃষকের জীবনে এই উচ্ছেদ ছিল বাস্তব সত্য। দক্ষিণ ভারতের লেখতেও উচ্ছেদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে এই উচ্ছেদ প্রথা ভারতে সর্বব্যাপী ছিল না। তবে এখানে স্মরণ থাকা উচিত যেখানে কৃষি শ্রমিকের অভাব ছিল না সেখানে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত। অন্যত্র অনুন্নত জনবিরল অঞ্চলে তা করা হত না। সেখানে বরং কৃষককে জমির সঙ্গে আরও আবদ্ধ করে রাখা হত। তাই বলা যায় ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভারতের তথাকথিত সামন্ততন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

এই অত্যধিক করভারের সঙ্গে সঙ্গে যে অঞ্চল দান করা হত সেই অঞ্চলে জমির উপর গ্রাম সম্প্রদায়ের অধিকার ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। বিশেষ করে আদিমধ্য যুগে অর্থাৎ ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। গুপ্তযুগে বাকাটকদের দানপত্রে দেখা যায় যে জমি হস্তান্তরের সঙ্গে জমি, চারণক্ষেত্রের উপর অধিকারও হস্তান্তর হয়েছিল। গুপ্তযুগের পরে এই ধারা পূর্বভারতে, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানের মতো গুজরাটে বিস্তারলাভ করেছিল। পাল ও প্রতিহারদের লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বভাবতই কৃষি অর্থনীতি বিশ্লেষণে দেখা যায় আদিমধ্য যুগে ভূমিদানের মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনার পরিবর্তে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে দীনেশচন্দ্র সরকার ও হরব মুখিয়া মনে করেন যেহেতু এযুগে কৃষক উৎপাদনের

উপাদানগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল তাই সেখানে তেমন কৃষক উৎপীড়ন ছিল না। ভারতীয় অর্থনীতিতে ইওরোপীয় কিছু সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটলেও ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের ইতিবাচক যে দিকগুলি বিকশিত হয়েছিল তাও এযুগে বিকশিত হয়নি। তবে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এ যুগে কৃষকের যে স্বাধিকার ও অধিকার বিনষ্ট হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। নগরায়ণের প্রক্রিয়াও ছিল একবার উত্থান, একবার পতন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈদেশিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এযুগে সজীব ছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চোলদের বাণিজ্যের প্রাধান্য সম্পর্কে দ্বিমত নেই। বাংলারও এসময় বাণিজ্যের খ্যাতি ছিল তা ইবন খোরদাদরাহ্ ও অল্-ইদ্রিসের বিবরণে জানা যায়। তাই আদিমধ্য যুগে তথাকথিত সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। তবে সর্বত্র একই সঙ্গে একইভাবে বিকাশলাভ করেছিল তা বলা যায় না। তাছাড়া সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে চুক্তির গুরুত্বও অপরিসীম। অথচ তাম্রশাসনগুলিতে চুক্তির কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাম্রশাসনগুলিতে বা অন্যান্য তথ্যে চুক্তির অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে সেখানে সামন্তব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রচলিত না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, সামন্ততন্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সার্ফ বা দাসপ্রথা ও ম্যানরব্যবস্থা ভারতে কোনকালেই প্রচলিত না থাকায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে বিশেষ ধরনের তথাকথিত সামন্ততন্ত্র বলাই ভালো। এমনকি কার্ল মার্কস-এর এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ভারতের সামন্ততন্ত্রের উপাদানের বিকাশের সম্পর্কের বিষয়েও অধ্যাপক কোসাম্বি ও শর্মা একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির ধারণার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধারণার কোন মিল নেই। কারণ তাঁদের মতে প্রাচীন ভারতবর্ষে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল এবং রাজা কর্তৃক গড়ে ওঠা শাসক শ্রেণীর দ্বারা জনসাধারণের কাছ থেকে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আদায় করত। আবার এযুগে নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে কখনোই ইওরোপীয় মডেলের সামন্ততন্ত্র বলা যায় না। তাই একে এক নতুন 'মডেলের' ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলা যেতে পারে।